যখন সম্পাদক ছিলাম

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক কারণে ভারত ছিল অগ্নিগর্ভ। বিশেষ ভাবে উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব এলাকা ছিল ভয়ঙ্কর ভাবে উত্তপ্ত। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতে ফিরলেন। কিন্তু ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ পক্ষকে সহায়তা দিলেন এই আশায় যে, এই 'সেবা কার্যে'র প্রতিদান স্বরূপ বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেবে। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর ভারতে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হ'ল। ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ Rowlatt Act জারী হ'ল। এই বিশেষ আইনের বলে ভারতের বড়লাটকে অবাধে গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসী ও কারাদণ্ড দেওয়ার (বিনাবিচারে) সর্বাত্মক ক্ষমতা দেওয়া হ'ল। এর ফলে ভারতীয় জনমত ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ও গান্ধীজীর নেতৃত্বে ৬ই এপ্রিল, ১৯১৯, ভারতব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হ'ল। হিন্দুমুসলমান সমস্ত সম্প্রদায় রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠল। এরই পরিণতিতে এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবের দুইজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ডঃ সত্য পাল ও ডঃ কিচলুকে অমৃতসর থেকে বহিস্কার করা হ'ল। ফলে পাঞ্জাব অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিকে গায়ের জোরে দমন করার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবের গভর্ণর ও'ডায়ার ও সেনাপতি ডায়ার সশস্ত্র সৈন্য সমাবেশ করলেন। এবং সৈন্য ও পুলিশের সঙ্গে জনমতেরও সংঘাত সৃষ্টি হ'ল। ১৩ই এপ্রিল তারিখ ছিল চৈত্র সংক্রান্তির মেলা—এই উপলক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগের বেষ্টনীর মধ্যে ২০ হাজার নরনারী সমবেত হলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। যাতায়াতের জন্য একটি মাত্র সংকীর্ণ দ্বার ছিল। এই সময় জেনারেল ডায়ার পাঞ্জাবের জনগণের প্রকাশ্য বিদ্রোহের কল্পনা করে সশস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। এবং যাতায়াতের একটি মাত্র সংকীর্ণ পথ বন্ধ করে দিয়ে তাঁর হুকুমে সৈন্যরা গুলি চালাল। অগণিত নির্দোষ নরনারী ও অসহায় শিশুরা হতাহত হ'ল। হাজারখানেক মানুষকে খুন করে এবং দু'হাজার মানুষকে আহত করে সৈন্যেরা যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গীতে বীর দর্পে জালিয়ানওয়ালাবাগ ত্যাগ করে চলে গেল। এই বর্বর ঘটনায় সমগ্র ভারত সন্ত্রস্ত ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। তখন সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র মহাকবি

রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে এগিয়ে এলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার, ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানানোর জন্য। তিনি সরলা দেবী চৌধুরানীর কাছে পাঞ্জাবের নারকীয় ঘটনাবলীর বর্ণনা শুনেছিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে তিনি যে অদ্ভুত ঐতিহাসিক পত্রটি লিখেছিলেন ইংরেজী জানা প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত আজো সেই দলিলটি পাঠ করা। বৃটিশ সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানজনক নাইটহুড বা স্যার উপাধি তিনি ঘৃণাভরে বর্জন করলেন। বলাবাহুল্য যে বৃটিশ পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নানা নিন্দা ও গ্লানি প্রচারে মেতে উঠেছিল। এই সমস্ত ঘটনারই উত্তপ্ত পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০-২১ সালে মহাত্মা গান্ধী ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সারা ভারতের জনসমুদ্রে যেন উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিল। ভারতের জাতীয় জীবনের সেই ঐতিহাসিক দিনগুলোতে আমি ছিলাম স্কুলের নাবালক ছাত্র মাত্র। এবং সেই স্কুলও নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের কিংবা অত্যন্ত অনুন্নত গ্রামের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়—'গ্রামে-গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'—গান্ধীজী ও কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ঘোষিত স্বরাজ অর্জনের সংকল্প তখনকার পূর্ববঙ্গের সুদূরবর্তী অখ্যাত গ্রামগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ল। সেই অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণ ও জনসমুদ্রের ঢেউ ছোট বড় সমস্ত শহর বন্দর ও হাট বাট মাঠ পেরিয়ে—'ছোট ছোট শান্তির নীড়' গ্রামগুলিকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করল। এই অপূর্ব দৃশ্য যাঁরা জীবনে দেখেননি, তাঁদের বোঝান যাবে না 'গরীবের মহারাজ' মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কী আশ্চর্য সংগ্রামমুখী জনতার সমাবেশ ঘটেছিল হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা এবং পেশোয়ার থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত।

জনগণের হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধীর আসন কতখানি গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল, তা' বোঝা যাবে আমাদের ছোটবেলার দু'চারটি কতাবার্তা বা ঘটনায়। আমরা ছেলেরা তখন বলাবলি করতাম—'লোকে অ আ ক খ ভুলে যেতে পারে, কিন্তু গান্ধীর নাম কখনও ভুলবে না!'

একদিন আমরা স্কুলে শুনলাম মহাত্মা গান্ধী স্টীমারযোগে চাঁদপুর থেকে বরিশালে যাবেন। শুনেই আমরা ছেলেরা উৎসাহী হয়ে উঠলাম এবং আমরা কয়েকটি ছেলে সেই ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) রুদ্রকর গ্রামের স্কুল থেকে নৌকাযোগে বোধহয় ডামুডিয়ার দিকে রওনা হলাম। সারা রাত নৌকা চালিয়ে আমরা দিনের বেলা গিয়ে সেই নদীতীরে পৌঁছুলাম। সেখান দিয়ে গান্ধীজীর ষ্টীমারযোগে বরিশাল যাওয়ার কথা। আমরা ছেলেরা গভীর ঔৎসুক্য সহকারে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং যখন শেষ পর্যন্ত সত্যি

সত্যি সেই স্টীমার দেখা গেল—বোধহয় ডেকের উপর লাল শালু টাঙানো ছিল—আর সেই শালুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং আর মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলী—খিলাফত আন্দোলনের নেতৃদ্বয়, আমরা তীর থেকে জয়ধ্বনি করে উঠলাম।

আমাদের ছেলেবেলায় এই সমস্ত ঘটনা থেকেই বুঝা যাবে সেদিন গান্ধীজীর কী জনপ্রিয়তা ছিল। এদিকে আইন আদালত, কোর্ট কাছারি, সরকারী চাকুরী ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে স্বরাজ অর্জনে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হ'ল। সরকারী স্কুলকলেজ বর্জন করে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এবং চরকা কাটার ও খদ্দর পরার ধুম পড়ে গেল। এ অবস্থায় স্বভাবতই শ্লোগান প্রচারিত হ'ল পরাধীন ভারতের এই সমস্ত 'গোলামখানা বর্জন কর', কারণ, 'Education may wait but Swaraj cannot' অর্থাৎ শিক্ষা অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজ পারে না। আমরা স্কুলের ছাত্ররা ছিলাম অপরিণত বুদ্ধির। সুতরাং এভাবে স্কুল কলেজ বর্জনের যে একটা খারাপ দিকও ছিল, সেটা উপলব্ধি করার মত বয়স ছিল না। অথচ নেতারা ছিলেন অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুশিক্ষিত। এবং উচ্চপর্যায়ের নেতারা—গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল নেহেরু প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা ছিলেন বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার অথবা অ্যাডভোকেট। সুতরাং সেদিক দিয়ে নেতারা বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হন নি। কিন্তু আমাদের মতো গরীবঘরের, বিশেষত গ্রামের ছেলেদের কার্যত শিক্ষা বিপর্যয় ঘটে গেল। এবং পরবর্তী কালে স্বাধীন ভারতেও এর কুফল দেখা গেল। অনেকের অদৃষ্টেই বেকারী ও দারিদ্র আরো কঠোর ভাবে চেপে বসল। সরকারী কিছু দান খয়রাতী বা বৃত্তি সত্ত্বেও অনেক জীবিত সংগ্রামী নেতা বা স্বেচ্ছাসেবকরা আজও বিড়ম্বনায় ভুগছেন।

সেই আন্দোলনের ধাক্কায় আমাদের স্কুল ১৯২১ সালে পুরো একবছর বন্ধ ছিল। কিন্তু আমাকে ভাল ছাত্র হিসেবে গণ্য করে একেবারে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীতে কিংবা ম্যাট্রিক ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া হ'ল। এদিকে তখন ঘটনাচক্রে স্কুলে কোন হেডমাস্টার ছিলেন না। এর পরে যিনি হেডমাস্টার হয়ে এলেন তিনি ছিলেন এক তরুণ বয়স্ক স্কলার। তাঁর নাম উপেন রায়। তাঁর সঙ্গে আমি ও অন্যান্য কয়েকটি ছেলে পড়াশোনার নাম করে আড্ডা দিতাম এবং রবীন্দ্রনাথ, ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত কবি নজরুল ইসলাম এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতাম। তাঁরই উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা একটি হাতের লেখা স্কুল ম্যাগাজিন বের করতাম। সেখানে আমি গদ্য পদ্য সব কিছুতেই হাত পাকাবার চেষ্টা করতাম। উপেন

রায় সাহিত্যরসিকও ছিলেন। পরবর্তী কালে স্বায়ত্বশাসিত ত্রিপুরা রাজ্যে তিনি আইনসভার স্পীকার পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে আমার কথা নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর সঙ্গে আমি পরবর্তীকালে আগরতলাতে গিয়ে দেখাও করেছিলাম। তাঁর বাড়ী ছিল বিলোনিয়ায়।

কিন্তু এ সমস্ত বহুল প্রচারিত তথ্যের পুনরাবৃত্তি। ১৯২০-২১ সালে আমাদের গ্রামে উচ্চ প্রাইমারী স্কুল ছাড়া কোন ইংরাজী হাই স্কুল ছিল না। আমাদের গ্রাম ছিল পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার পালং-এর নিকটবর্তী ছয়গাঁও (অধুনা বাংলাদেশ) যেখানে ছিল আমাদের বাসভূমি। কিন্তু আমি জন্মেছিলাম নদীতীরবর্তী ডোমসার কুমোরপুর গ্রামে। সেই নদী-তীর। নদীর দুর্দান্ত ভাঙন ও শরৎকালে কাশফুলে ভরা চর আমার ছোটবেলাতেই কাব্যের প্রেরণা দিয়েছিল।

কিন্তু তিন মাইল দূরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে বড় বড় হাইস্কুল ছিল। সেদিনের পূর্ববঙ্গে লেখাপড়ার প্রচুর চর্চা ছিল। তখন আমাদের গ্রামের অদূরবর্তী রুদ্রকর নামক গ্রামে নীলমণি হাইস্কুল বিদ্যালয় থেকে নতুন নতুন ছাত্র ভর্তির আবেদন শোনা গেল। এই বিদ্যালয়টি ও রুদ্রকর গ্রাম আমার লেখাপড়ার জীবনে একটা বিচিত্র আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই আবহাওয়ার মধ্যে রোমান্টিসিজম্ ও রিয়ালিজম্ দুই প্রকার উপাদানই প্রচুর ছিল। আমি ছিলাম একটি নগণ্য গ্রামের অভাবগ্রস্ত বাড়ীর গরীব অথচ শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। আমার পিতৃদেব (কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায়) ছিলেন ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষিত এবং সেক্সপিয়ারের ভক্ত। আমি সেই বয়সেই সেক্সপিয়ারের নাটকগুলির কিছু কিছু গল্প আমার পিতার কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু তিনি ছিলেন উদাসী সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ। তিনি আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। সে অবস্থায়ও তিনি অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে প্রাইভেট টিউশনি করে নিজের জীবিকা অর্জন করতেন। কখন কখন দু'চার বছর বাদে বাদে সংসার জীবনে ফিরে আসতেন। সেই সময় তিনি গ্রামের নতুন গ্রাজুয়েট ছেলেদের সঙ্গে সেক্সপিয়ার নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি আমাকে ছোটবেলাতেই ইংরাজী ভাষায়, বিশেষ করে ইংরেজী ব্যাকরণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আশ্চর্য এই যে, কার্যতঃ ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত ইংরেজী ব্যাকরণ নিয়ে আমার বিশেষ মাথা ঘামাতে হয়নি। সেই বয়সেই আমার বাংলা ও ইংরেজী রচনা পড়ে তিনি আমার মায়ের কাছে মন্তব্য করেছিলেন—"তোমার এই ছেলে বেঁচে থাকলে বড় হবে।"

আমার মা (মনোমোহিনী দেবী) ছিলেন শিক্ষিতা মহিলা এবং লেখা পড়ায় ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। এমন কি ভাল করে পড়াশোনা না করলে

তিনি কোন কোন দিন আমাকে লেখাপড়া না করা পর্যন্ত খেতে দিতেন না।

মা ইংরাজীও কিছু কিছু বুঝতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বিনী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা। এবং সুদর্শনা বলেও তাঁর সুনাম ছিল····

আমি আমাদের গ্রামের কুটীর থেকে এসে পড়লাম মুদ্রকর জমিদার বাড়ীর প্রকাণ্ড সাত মহলার রাজবাড়ী সদৃশ এক অদ্ভুত বাড়ীতে। সেই ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের (চক্রবর্তী) স্থানীয় অঞ্চলে খুব নাম ডাক ছিল। তাঁদের পূর্বপুরুষ নীলমণি চক্রবর্তীর নামেই নতুন হাইস্কুলের নামকরণ হয়েছিল। তাঁদের বাড়ী থেকেই প্রায় সত্তর আশিটি ছেলে স্কুলে যাতায়াত করত। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আমরা যখন সেখানে ভর্তি হতে গেলাম তখন দেখা গেল ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই। অর্থাৎ নতুন ছেলে নেওয়ার এবং আশ্রয় দেওয়ার মত জায়গা আর নেই। কিন্তু জমিদার বাড়ীর উৎসাহী কর্তা ব্যক্তিরা আমাকে দেখে এবং আমার সঙ্গে কথা বলে খুব impressed হয়ে বললেন,—"এই ছেলেটিকে যে ভাবেই হোক আমাদের বাড়ীতে রেখে স্কুলে ভর্তি করতে হবে।"

সেই বাড়ীটি ছিল অতি বৃহৎ। প্রকাণ্ড কালীমন্দির, পূজা মণ্ডপ (তিনটি দুর্গাপূজা একবাড়ীতেই হ'ত)। দীঘি ও সরোবর এবং পুষ্করিণী ইত্যাদি মিলিয়ে সেই বাড়ীটির আয়তন আনুমানিক তিনশ বিঘা বা তার বেশীও হতে পারে। সমস্ত বাড়ীটাই ছিল দালান কোঠায় ভর্তি এবং বাড়ীটি তিন অংশে বিভক্ত ছিল—সাত আনা, পাঁচ আনা ও চার আনা। কিন্তু সব মহলেই তখন বাইরে থেকে ছাত্র নেওয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তথাপি আমাকে তাঁরা ছাড়তে চাইলেন না। অবশেষে তাঁরা স্থির করলেন আমাকে ঠাকুরের বা অতিথির পালায় (সেকালে বড় লোকদের বাড়ীতে এ সকল প্রথা প্রচলিত ছিল) গ্রহণ করা হবে। অর্থাৎ আমাকে ঘুরে ঘুরে চার, পাঁচ, ও সাত এই তিন হিস্যায় খেতে হবে। কিন্তু আমার বাসস্থান স্থির হ'ল পাঁচ আনির মহলে। ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছিলাম বলে অল্প দিনেই আমি সকলের স্নেহ ও ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠলাম। কিন্তু এত বড় বাড়ীতে যেখানে প্রতিদিন প্রায় দুমন চাল রান্না করা হ'ত সেখানে প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যেও আমার জীবনযাত্রা কিন্তু সহজ ও স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু কিছু কিছু রোমান্টিক ঘটনাও ঘটেছিল। সেগুলিতে ছিল গল্প উপন্যাসের মশলা।

সেই বাড়ীতে 'ভাল বউ' নামে একটি সুশিক্ষিতা বধূ ছিলেন। এবং তিনি সেই গ্রামেরই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ছিলেন (তাঁর বাবা ছিলেন নাম করা ডাক্তার এবং তাঁর ভ্রাতা পরবর্তীকালে কলিকাতার অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন E.N.T. স্পেশালিষ্ট ছিলেন)। সেই ভাল বৌদির সঙ্গে ঐ কিশোর বয়সেই আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাদের গৃহে যে সমস্ত ভাল ভাল বাংলা বই ছিল মাঝে মাঝে

তিনি আমাকে সেগুলি এনে পড়তে দিতেন। আমি তখন বিভিন্ন স্থান থেকে মডার্ন রিভিউ, ভারতবর্ষ ও নব প্রকাশিত মাসিক বসুমতী এনে পড়তাম ও মাঝে মাঝে ভাল বৌদিকে শোনাতাম (এখানে উল্লেখযোগ্য, তখন ইংরাজী মাসিকপত্র মডার্ন রিভিউতে কভারের উপর এই মর্মে বিজ্ঞাপন ছাপা হ'ত—উইলি পিয়ারসন কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস ইংরাজিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে)।

পূর্বেই বলেছি আমি খুব অভাবগ্রস্ত পরিবারের ছেলে ছিলুম। সুতরাং উপযুক্ত পাঠ্যবই কেনারও সামর্থ্য ছিল না। আমার ঘরে অবনী দীঘাল নামে একটি ছেলে ছিল। আমি তার পড়া শুনে আমার নিজের পড়া তৈরী করতাম।

এদিকে ভালো বৌদি মাঝে মাঝে এসে খবর নিতেন। যখন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম (কারণ সেদিনের অভিভাবকেরা শরৎচন্দ্রের লেখাকে অশ্লীল মনে করতেন) তখন নারী জাতির বেদনা নিয়ে গভীর দুঃখবোধ করতাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁকে নারী জাতির এই দুর্দশার কথা বললাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশিক্ষিতা মহিলা। তিনি আমাকে জবাব দিলেন—মেয়েরা যে এত নীচতলায় দুরবস্থার মধ্যে পড়ে আছে, সে সম্পর্কে তাদের নিজেদের কোন চৈতন্য নেই।

বৌদি কোন কোন দিন রাতে আমার কাছে এসে খোঁজ নিতেন আমি কি করছি ? আমার তখন খাতা পেন্সিল কেনারও পয়সা ছিল না। সুতরাং শ্লেট পেন্সিল ব্যবহার করতাম। এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মাঝে মাঝে শ্লেটে কবিতা লেখার চেষ্টা করতাম ঘুম তাড়াবার জন্য। এই সময় হঠাৎ একদিন রাতে এসে তিনি বললেন—শোনতো ঠাকুরপো, রান্না ঘরে হঠাৎ আমার একটু দরকার পড়েছে। আশ্চর্য এই যে, সেই সুবৃহৎ জমিদার বাড়ীতে রান্নার জন্য কোন পাচক ছিল না। বাড়ীর বউরা সেই দায়িত্ব পালন করতেন। সেই সময় বাড়ীর অন্দর মহলে শহরের মত রাস্তার আলো বা স্ট্রিট ল্যাম্প ছিল। বৌদি আদেশ করা মাত্র আমি দেবর লক্ষ্মণের মত শ্লেট পেন্সিল হাতে করে তাঁর সহযাত্রী হলাম। রান্নাঘরে ঢুকে বাটনা বাটতে বাটতে তিনি সহসা জিজ্ঞেস করলেন—শ্লেট পেন্সিল নিয়ে কি করছিলেন? আমি সলজ্জভাবে জবাব দিলুম—একটি কবিতা লিখছিলুম। বৌদি সবিস্ময়ে এবং কৌতুক মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন কবিতা ? আচ্ছা, পড়ুনতো, শুনি।'

সেই বহু দূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় ঘটনাবলীর মধ্যে আজও সেই কাঁচা হাতের ছেলেমানুষি কবিতার কয়েক লাইন স্মরণে আছে—

ঘুমের মাঝারে স্বপনের মত
আসিও তুমি আসিও।
নিশার আঁধারে তারকার মত
হাসিও হাসিও।

ভালো বৌদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং বললেন—আজ আপনি বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি বলছি ভবিষ্যতে আপনি একদিন বাংলা দেশের নাম করা কবি ও সাহিত্যিক হবেন।

যতদূর মনে পড়ে এটা ১৯২২ সালের ঘটনা। একটি গ্রাম্য বধূর সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজও আমার স্মৃতির আকাশে জ্বল জ্বল করছে। ভালো বৌদির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ক্রমশঃ এমন গাঢ় হয়ে উঠলো যে, ওটাকে মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় বোধ হয় Platonic love বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। আমার ছয়গাঁও গ্রামের বাড়ীতে একটি কুল গাছে অসময়ে একটি ভালো 'নারিকেল কুল' হয়েছিল। সেটি পাকা অবস্থায় আমি গাছ তলাতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তখনই ভাবলুম এই অসময়ের চমৎকার কুলটি দিয়ে কি করা যায়? তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল ভালো বৌদির কথা। আমি সেই কুলটি পকেটে নিয়ে বড়ঘরের সেই জমিদার বাড়ীতে ভাল বৌদির হাতে উপহার দিলুম। বৌদি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইলেন।

আমি যখন ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিক বা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে মাদারিপুর সদর মহকুমা কেন্দ্রের দিকে একদিন সকাল বেলা যাত্রা করলুম, তখন সহসা উপস্থিত মহিলাদের মধ্যে কে একজন আমার উদ্দেশ্যে পিছন থেকে বললেন—কি রে, তোর ভাল বৌদিকে প্রণাম করলি না?

আমি তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরে এসে ভালো বৌদির পায়ে প্রণাম করলুম এবং যতক্ষণ আমাকে দেখা যায় তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার আজও মনে পড়ে তাঁর সেই সুন্দর উজ্জ্বল চোখ দুটি। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সেই বিখ্যাত লাইটিও মনে পড়ে গেল—

বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

আশ্চর্য এই যে, আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে এবং আমার স্কুল জীবন শেষ করে আমার গ্রামের বাড়ীতে ফিরে এলাম তখন ভালো বৌদির বিচ্ছেদ বেদনায় আমি অনেক দিন পর্যন্ত মর্মাহত ছিলাম। এমন কি বেদনায় ভরা একটি চিঠিও তাঁকে লিখেছিলাম। এবং তিনিও জবাবে লিখলেন "আমার চারদিক যেন শূন্য হয়ে গেছে। আর সেই কবিতার গুঞ্জন আমার কানের কাছে শুনি না।"

সত্যি সত্যি আমি তাঁকে অনেক কবিতার গুঞ্জন শুনিয়েছিলাম। একদিন ভাল বৌদি বিমর্ষ মুখে বসে আছেন। মনে পড়ে গেল তাঁর স্বামী কলিকাতার হোস্টেলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করছেন। ক্লাশ খুলছে, কাজেই

তিনি কলিকাতায় চলে গেলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গিয়ে কবিশেখর কালিদাস রায়ের সদ্য প্রকাশিত (মাসিক বসুমতী, না ভারতবর্ষ মনে নেই) একটি কবিতা গুঞ্জন করে শুনালাম ঃ

বিধুমুখী সখি, একি একি দেখি
কপোলে গড়ালো নয়ন জল,
গাহিল যে ছিয়া কোথা গেল প্রিয়া
এত গরবের বুকের বল ?

বৌদি ম্লান হাসি মুখে আমার দিকে তাকালেন এবং আমি জানতাম অত বড় রাজপ্রাসাদের মত বাড়ীতে তাঁকে আর কেউ কবিতা গুঞ্জন করে শোনাবে না।

বাংলাদেশের অনেক তরুণদের মত আমারও লেখক জীবন শুরু হয়েছিল কবিতা দিয়েই। নজরুল ইসলামের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছিল সেই দূরবর্তী গ্রামে আমার উপর। তখন ছিল জাতীয় জাগরণ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের দিন। সুতরাং সেই সময়ের অধিকাংশ লেখাতেই একটা গরম সুর ছিল। তখন 'উদ্বোধন' নামে আমার একটা কবিতা রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালিত বিখ্যাত উদ্বোধন পত্রিকায় একবারে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। ১৯২৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী হয়ে (তখন লেখাপড়া খুব ভালো হতো। আমরা গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাত্র একজন ছাড়া সকলেই প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলাম। আমি দুটি লেটার পেয়েছিলাম এবং আরও দু'তিন জনও অনুরূপ লেটার পেয়েছিলেন) আমি গিয়েছিলাম হুগলী চুঁচুড়াতে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে কলেজে ভর্তি হওয়ার আশায়। সেখানে পড়ার দিকে আমার প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যেতে পারলুম না। এমন কি আমি যখন আনন্দবাজার পত্রিকায় শিক্ষানবীশ সাংবাদিক হিসাবে কাজ করছিলুম, তখনও স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সেই সময় স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ আর্কুহার্ট। তিনি আমার আবেদনপত্রটি ভাল করে পড়লেন, এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অনেক বছর হয়ে গেছে।" তারপর আমার আবেদন পত্রের উপর লিখেছিলেন "please apply to the Vice-Chancellor of the Calcutta University through the Principal of this College"। অথচ বোধ হয় সেই সময় তিনি নিজেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের কাজ করছিলেন। এটা পড়ে আমার খুব কৌতুহল বোধ হল

এবং সেই অনুসারেই দরখাস্ত করলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কোন কাজ হ'ল না। অর্থাৎ কলেজে ভর্তি হতে পারলাম না। তবু একদিন আমি আমাদের গ্রাম দেশের একটি ছাত্রের সঙ্গে স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা ক্লাশে যোগ দিলাম। আমার জানবার খুব কৌতূহল ছিল কি ভাবে কলেজে লেখাপড়া হয়। বাংলার অধ্যাপক মহাশয় ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন একটি ছাত্রের দিকে তাকিয়ে "বল তো 'উদ্‌বেল' মানে কি ?" ছেলেটি চটপট জবাব দিল—'স্যার কদ্‌বেল' ! ক্লাস শুদ্ধ হাসির রোল পড়ে গেল।

আমার কলেজে শিক্ষালাভের চেষ্টা সেখানেই ইতি হ'ল। তখন আমার স্বপ্ন ছিল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্কলারদের মধ্যে একজন হওয়া। এর মূলে ছিল সেদিনের বিখ্যাত স্কলার ছাত্র সুবোধ সেনগুপ্তের দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি (১৯৮৫) তিনি পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবং কয়েকটি মূল্যবান বই লিখেছেন। তিনি আমার চেয়ে দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু আমার সেই উচ্চাভিলাষ আর পূর্ণ হ'ল না। এর জন্য আজও—এই ৮২ বছর বয়সে দুঃখ বোধ করি।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর আমি হুগলির চুঁচুড়ায় এলাম। তখন সেখানে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় নামে আমার মত তরুণ বয়স্ক একজন উৎসাহী সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি শহরের ছেলে। আমার মতো গেঁয়ো নয়। তাঁর কথাবার্তায় বেশ শহুরে বোল-চাল ছিল। যেমন,—তিনি প্রায়শই আমার কাছে এসে বলতেন, মন্টুদা, কাজিদা প্রভৃতি নাম অর্থাৎ দিলীপ কুমার রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি। এই সমস্ত বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন আমার কাছে প্রণম্য। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সম্ভব তা আমি কল্পনাও করতে পারতাম না। তবে প্রানতোষের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। একদিন আমাকে বললেন, "কাজিদার কাছে যাবে ?" আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অবশ্য সে তখনই আমাকে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের গৃহের দিকে চলল। নজরুল ইসলাম তখন হুগলিতে একটি সাধারণ দেড়তলা বাড়ীতে বাস করতেন। প্রাণতোষ সেই বাড়ীর দরজার কাছে এসে হাঁক দিতে লাগল, "কাজীদা বাড়ী আছ ?" উপর থেকে সাড়া এল "কে ?" নীচু থেকে জবাব গেল, "আমি প্রাণতোষ"। নজরুল ইসলাম চটপট নীচে নেমে এলেন, প্রাণতোষ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বলুনতো কাকে সঙ্গে এনেছি ?" নজরুল আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং তারপর জবাব দিলেন "বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় !" আমি যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জীবনে যাঁর সঙ্গে কোনদিন দেখা হয়নি আলাপ হয় নি তিনি কেমন করে আমার নাম ধাম জানলেন ? তবে কি নজরুল যাদুবিদ্যা জানেন ?

এই রহস্যের জাল পরে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। উদ্বোধন পত্রিকার যে সংখ্যায় আমার কবিতাটি ছাপা হয়েছিল সেই সংখ্যাতেই নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার একটি উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি সূচক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। নজরুলকে কেন্দ্র করে তখন হুগলিতে যে একদল তরুণ উৎসাহী যুবক ও ভক্তের সমাবেশ হত সেই বৈঠকে উদ্বোধন পত্রিকার সেই সংখ্যাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছিল। আমার নাম (তখনকার দিনে এই নামের কোন লোক বাংলাদেশে ছিল না) তখন কেউ জানতোনা। অথচ রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকায় বিবেকানন্দ মুখোপধ্যায় নামীয় কোন লেখকের কোন কবিতা এভাবে ছাপান হওয়ায় নজরুলের আড্ডাতে একটি বিচিত্র কৌতূহলের সৃষ্টি করল। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেই আড্ডার একজন প্রাণবন্ত সদস্য (পরবর্তী কালে প্রাণতোষ একজন খ্যাতিসম্পন্ন বিপ্লববাদী লেখক বলে স্বাতন্ত্র অর্জন করেছিলেন), তিনি বললেন, "আমি এ লেখককে খুব ভাল ভাবে চিনি।" সেই সূত্রেই নজরুল ইসলাম প্রাণতোষের সঙ্গে আমাকে দেখতে পেয়ে অনুমান করে আমার নাম বলতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ এর মধ্যে কোন সাপের মন্ত্র ছিল না।

হুগলিতে আমি নজরুল ইসলামের আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতাম। তখন দেশব্যাপী নজরুলের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। দলে দলে ছেলেরা তাঁর কাছে আসত। এবং অবাক হয়ে দেখতাম হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব যুবক তাঁর পায়ের ধুলো নিচ্ছে। বোধ হয় তিনিই সেকুলারইজমের অগ্রদূত ছিলেন। আমি সেদিনের (১৯২৩ সালের) গ্রাম দেশের ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। সুতরাং নজরুলের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করাটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। আমার লেখা দুএকটি কবিতা নজরুলকে শুনিয়েছিলুম। নজরুলের মত মহানুভব উদার ও স্নেহশীল সাহিত্যিক আমি জীবনে দেখেনি। আর সেই সময় তাঁর চেহারার মধ্যে কী দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। বড় বড় চোখ এবং সে চোখের কী গভীর দৃষ্টি, ভরাট গোল মুখ এবং মাথায় কোঁকড়ানো চুল যে কোন মানুষকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। ফলে নর এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই নজরুলের প্রতি অসামান্য আসক্তি দেখা দিল। তাঁকে নিয়ে সর্বত্র এত টানাটানি শুরু হ'ল যে, নজরুল এক নতুন 'যুগন্ধর পুরুষ' রূপে প্রতিভাত হলেন। বলাবাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁকে আশীর্বাদ সহ বই উৎসর্গ করলেন। নজরুলের এত মিটিং করার খবর শুনে রবীন্দ্রাথ নাকি একবার বলে পাঠিয়েছিলেন—'ওহে নজরুল খ্যাতির নেমতন্নে পাত পেতে বসে যেও না।' আমি অবশ্য জানি না রবীন্দ্রনাথ এমন রসিকতা করেছিলেন কিনা। নজরুল যখন হুগলি জেলে উপোস করছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই উপোস ভঙ্গের জন্য অনুরোধ করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

আমি নজরুলের স্নেহাশীসে ধন্য হলাম। কেউ তাঁর কাছে কবিতা চাইতে এলে তিনি আমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলতেন, "ওর কাছ থেকে কবিতা নাও না ? ওতো Morning star—প্রভাতের শুকতারা।"

এই নজরুল ইসলামই ট্রাজেডির অন্যতম নায়ক। কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। আমার মনে আছে তখন সবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। কলিকাতায় ব্ল্যাক আউট। আমি তখন দেশবন্ধু পার্কের এলাকায় একটি ফ্ল্যাটে থাকতাম। একদিন সন্ধ্যার পর দু-তিনজন যুবক একটি ট্যাক্সিতে নজরুলকে নিয়ে আমার কাছে এলেন আমাকে নেওয়ার জন্য এবং একটি মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার জন্য। সেই সময় নজরুল হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে অসংলগ্নভাবে বললেন—"জানিস আমি যেন একটা পাখী এবং আমাকে পলো চাপা দিয়ে রেখেছেন!" আমি অনুভব করলাম সম্ভবত এই অসাধারণ ব্যক্তির মাথায় কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর নজরুল সত্যি সত্যিই জ্ঞানহারা হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। আমি আর তাঁকে দেখতে যাইনি। কেননা তার সঙ্গে অন্যান্য দিক থেকেও আমার উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আমার শ্বশুর মশাই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সেদিনের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক এবং নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। দুজনে মিলে খুব আড্ডা দিতেন এবং গানের মজলিস উপভোগ করতেন, সেই সূত্র ধরেও নজরুল ইসলামের প্রভাব আমার উপর পড়েছিল। সুতরাং মহীরুহের মত বিরাট কবি ও সঙ্গীতকারের এই ট্রাজিক পরিণতি আমার কাছে খুব পীড়াদায়ক ছিল।

কলেজে ভর্তি হতে ও উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারলুম না বটে কিন্তু আমাকে তো বেঁচে থাকতে হবে। সুতরাং জীবিকার্জ্জনের প্রশ্ন দেখা দিল। ১৯২৩ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর হুগলি চুঁচুড়া হয়ে জীবিকার তাগিদে কলিকাতায় এলাম। উদ্বোধন পত্রিকার সূত্রে এবং স্বামী বিবেকানন্দের অনন্যসাধারণ প্রভাবের ফলে আমি বরাবরই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। সেদিনের স্বনামধন্য সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, যিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও স্ট্যালিনের জীবন চরিত্র লিখেছিলেন (স্ট্যালিনের জীবন রচনার ফলে বাংলা সাংবাদিকদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারই সর্বাগ্রে এবং স্ট্যালিনের জীবিতকালে সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন) তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। তিনি সেই সময় থাকতেন মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের একটি মেসে এবং তাঁর চরিত্র মাধুর্য্য, উদারতা ও বলিষ্ঠতার জন্য তিনি যুব সমাজের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আমি মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের মেসে দোতলায় তাঁর ঘরে গেলুম দেখা করার জন্য। সঙ্গে ছিল হাতের লেখা কবিতার

বই। কারণ তখনতো আমার অন্য কোন পরিচয় ছিল না। আমি সত্যেনদাকে (এই নামেই তিনি খুব মহলে পরিচিত ছিলেন) কয়েকটি কবিতা পড়ে শুনালাম। সত্যেনদা বললেন, তোর মধ্যে যেন বাইরণের সুর আছে। তারপর আমি তাঁকে জীবিকার প্রয়োজনের কথা বললুম। সব শুনে তিনি বললেন—তুই ছেলেমানুষ, তুই কি চাকরি করবি? আমি জবাব দিলুম, আমি সাধারণ চাকুরি চাই না। আমি সংবাদপত্রে ঢুকতে চাই। সত্যেনদা উত্তর দিলেন—বাঁদিস ফিরে, খবরের কাগজে ঢুকলেতো খেতে পাবি না।

আমি তবু সংবাদপত্রে প্রবেশের জন্য জেদ প্রকাশ করতে লাগলুম। সত্যেনদা যেন কতকটা নিরুপায় হয়েই বললেন—তবে আনন্দবাজার পত্রিকা আফিসে আয়, দেখি কি করতে পারি।

আনন্দবাজার পত্রিকা আফিস তখন কলেজ স্কোয়ারে শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেসের দোতলায়। শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেসের মালিক সুরেশচন্দ্র মজুমদারের তখন মুদ্রণ জগতে খুব নাম ডাক এবং নিজেও ছিলেন অত্যন্ত স্বদেশপ্রাণ ও কংগ্রেস ভক্ত—অবশ্য তখন অধিকাংশ পত্র পত্রিকাই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কিম্বা দেশোদ্ধার ব্রতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি এক দিন কলেজ স্কোয়ারের সেই বাড়িটার দোতলায় উঠে গেলাম—আর ওই বাড়িটাই পরবর্তীকালে প্রায় ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছিল। সেখানে প্রফুল্ল কুমার সরকার, মাখনলাল সেন প্রভৃতি নামজাদা ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় হলো এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় বিনা মাহিনায় শিক্ষার্থী সাংবাদিক হিসাবে গৃহীত হলাম। এটা ১৯২৫ সালের কথা। ১৯২৫-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত একটানা এগার বছর আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় ছিলাম। তারপর ১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে নব প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে যোগ দিলাম। যে ১১-১২ বছর আমি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সংবাদিক হিসাবে সেখানেই আমার ভিত খুব পাকা হয়েছিল। আনন্দবাজার ছিল নির্ভীক স্বাধীনতাবাদী এবং অত্যন্ত দেশপ্রেমিক—এমনকি আনন্দবাজারের দেশপ্রেম অনেক সময় জঙ্গীরূপও ধারণ করত। জেল, জরিমানা, প্রেস বাজেয়াপ্তির ভীতি ইত্যাদি নিপীড়নমূলক অবস্থার ভিতর দিয়ে যাত্রা করেও আনন্দবাজার কখনও সেদিনের বৃটিশ শাসন শক্তির কাছে মাথা নত করেনি। কত যে বিপদ আনন্দবাজারের উপর দিয়ে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আনন্দবাজার সত্যি সত্যি জাতীয়তার ও স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রফুল্ল কুমার সরকার, মাখনলাল সেন ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রত্যেকেই এক এক জন আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক যোদ্ধা ছিলেন।

মাখনলাল সেনের কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। তিনি

ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত সোনারং গ্রামের বিপ্লবী যুবক দলের একজন পাণ্ডা। বোধহয় সেই সময়ের সরকারী কোন গোয়েন্দা রিপোর্টে-notorious Makhan Sen of Dacca Sonarang বলে উল্লেখ করা ছিল। খুব তেজিয়ান পুরুষ ছিলেন এবং নির্ভীক ভাবে সব বিপদের সম্মুখীন হতেন। আনন্দবাজার পত্রিকার একেবারে গোড়ার দিকেই তিনি সংগঠক হিসাবে যোগদান করেন। আমার দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে আমি মাখনলাল সেনের মত এমন দক্ষ সংগঠক আর দেখিনি। অত্যন্ত দুরবস্থার ভিতর থেকে তিনি আনন্দবাজারকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে নিয়ে যান। আনন্দবাজারের উপর দিয়ে কত যে রাজরোষ ও ঝড় গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু নির্ভীক মাখন সেন ও সেই সঙ্গে নির্ভীক ও অত্যন্ত বলিষ্ঠ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—এই দুইয়ের যেন মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল। এঁদের সংস্পর্শে আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার সম্পাদকীয় লেখাও ক্রমশঃ বিকশিত হতে লাগলো। এমন কি কোন কোন সময় এমনও ঘটেছে যে, কোনটা সত্যেনদার লেখা আর কোনটা আমার লেখা সেই তফাৎও পাঠকরা ধরতে পারতেন না। সেদিনের বৃটিশ সরকার আনন্দবাজারকে শাসন ও জব্দ করতে কোন চেষ্টার ত্রুটি করেনি। নতুন জামানত দাবী ও প্রেস বাজেয়াপ্তির পর্যন্ত ভয় ছিল। কিন্তু আনন্দবাজারের কর্তৃপক্ষ একেবারে নির্বিকার ছিলেন। একবার 'সাহিত্যে সরকারী দৌরাত্ম্য' শীর্ষক একটি কড়া সম্পাদকীয় (আমার লেখা) প্রকাশের জন্য আনন্দবাজারের জামানত তিন হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং নতুন করে ছয় হাজার টাকার জামানত দাবী করা হলো। আমি মনে মনে একটু শঙ্কিত ছিলাম পাছে কর্তৃপক্ষ আমাকে এজন্য কিছু বলেন। কিন্তু আশ্চর্য, সম্পাদক কিম্বা মাখন সেন অথবা সুরেশ মজুমদার কেউ আমার উদ্দেশে টু শব্দটিও করলেন না। (দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না যে এত বড় সংগঠক মাখন লাল সেন, আনন্দবাজার পত্রিকার পরিপূর্ণ বিকাশে যার অবদান অবিস্মরণীয় সেই মাখন বাবুর কথা আনন্দবাজার পত্রিকার ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ চেপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বার বছর ধরে আমি আনন্দবাজারের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম যে মাখনলাল সেনের অবদান কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। অতএব আনন্দবাজারের ইতিহাস থেকে মাখনলাল সেনের অপলোপ নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক)। আমার সাংবাদিক জীবনে এঁদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম। আমি একজন বিনা বেতনের শিক্ষার্থী হয়ে আনন্দবাজারে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম, একথা আগেই বলেছি। শ্যামবাজারে একজন আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলাম। অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত ছিলাম, সুতরাং সেদিনে দুপয়সার ট্রাম ভাড়াও জুটাতে পারতাম না। শ্যামবাজার থেকে

কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত সারাটা পথই হেঁটে যাতায়াত করতাম। এভাবে আমি ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর একদিন সত্যেনদাকে বললাম,—"এভাবে তো আর অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না। সুতরাং কিছু আর্থিক ব্যবস্থা করা দরকার।" বলা বাহুল্য যে সেদিন আনন্দবাজার অত্যন্ত গরীব পত্রিকা ছিল। তবুও সত্যেনদা একদিন মাখনলাল সেনকে তাঁর অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক সুরে বললেন—"মাখনদা, বিবেকানন্দ কি এরপর পকেট কাটবে?" তাঁর এই উক্তিটি আজও আমার স্মৃতিতে জাগরূক আছে। মাখনবাবু সত্যেনদার মুখের দিকে তাকালেন। সত্যেনদা তখন আমার দুরবস্থার কথা মাখনবাবুকে বললেন, "আচ্ছা, অবিনাশকে বলে দিচ্ছি।" অবিনাশবাবু তখন ক্যাশিয়ার ছিলেন। আমি আশান্বিত হয়ে অবিনাশবাবুর কাছে দু-তিনদিন যাতায়াত করলুম। কিন্তু অবিনাশবাবুকে তখনও আমার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। অবশেষে যখন বলা হ'ল তখন আমাকে পঁচিশ টাকা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সাংবাদিক জীবনে সেই আমার প্রথম বেতন পঁচিশ টাকার প্রাপ্তি ঘটল। এই টাকাটা পেয়ে আমি মনে মনে ভাবলুম রাজা-উজির হয়ে গেছি। (অবশ্য সেদিনের ২৫ টাকা আজকের দিনের ৫০০ টাকার সমান)। আসলে অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় আসার ফলে এই ধরণের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আনন্দবাজার পত্রিকাতেই আমাদের সংগ্রামশীল সাংবাদিক জীবনের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমাকে এবং আমার মতো সমধর্মী সাংবাদিকদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে। সেদিনের সাংবাদিকতা ছিল পুরোপুরিই স্বদেশ হিতব্রতের সাধনা। এবং ওর মধ্যে কোন ফাঁক বা চাতুর্য নীতি ছিল না। এর ফলে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের শিষ্যরূপে আমরা যে কয়েকজন চিহ্নিত হয়েছিলাম তাঁরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯২৫ সালে আমি মাত্র শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (আনন্দবাজারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পাদক) আমাকে গোড়ায় তালিম দিতেন। আমার শিক্ষানবিশি শুরু হ'ল কাশীপুর অগ্নিকাণ্ডের এক রিপোর্ট দিয়ে। এবং ১৯৩৭ সালে জাপান কর্তৃক চীনের উপর যুদ্ধের অগ্নিবর্ষণ দিয়ে আমার আনন্দবাজারের কার্যকাল শেষ হ'ল। অর্থাৎ আগুন দিয়ে আরম্ভ এবং আগুনেই শেষ।

এর পর আমি নবপ্রতিষ্ঠিত যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকরূপে যোগদান করলাম। বলাবাহুল্য যে আনন্দবাজার ও অমৃতবাজার পত্রিকা এই দুই পত্রিকাগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাত ছিল। অবশ্য এর পিছনে

রাজনৈতিক মতবাদেরও সংঘর্ষ ছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা ছিল মূলতঃ সুভাষ গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। আর অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল এর বিপরীত দিকে গান্ধীবাদী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষক। আমার ছিল তখন অপরিণত বয়স। অতএব এই রাজনীতির গভীর তাৎপর্য তখন উপলব্ধি করতে পারতাম না। আমাদের কাগজে অর্থাৎ যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকার পিছনে ছিল বিধান চন্দ্র রায়, কিরণ শংকর রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নির্মল চন্দ্র চন্দ্র—যাঁরা একদা "Big Five" নামে পরিচিত ছিলেন—তাঁদের সমর্থন ও সহযোগিতা।

অমৃতবাজারের শ্রী তুষারকান্তি ঘোষই যুগান্তর পত্রিকা প্রবর্তন করেন। একেবারে শুরুতে যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (আনন্দবাজারের বাণিজ্য সম্পাদক) যুগান্তরের সম্পাদক রূপে যোগদান করেন। তিনি সেখানে আমার 'শিক্ষক' ও সিনিয়র ছিলেন। তখন প্রশ্ন উঠল যতীন বাবুও 'গরম' রাজনৈতিক লেখক নন এবং 'গরম' লেখা ছাড়া সেদিনের কাগজ চলতে পারে না। অতএব আমাকে নিয়ে টান পড়ল। কারণ তখন থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের পর 'গরম' সম্পাদকীয় লেখক হিসাবে আমার নাম পরিচিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় তখন আমি ১৩০ টাকা মাহিনা পেতাম। যুগান্তরের সম্পাদকরূপে আমি পুরো ২০০ টাকার বেতনে নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ পেলাম। সেই দূরবর্তী ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমি একাদিক্রমে পঁচিশ বছর ধরে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্ণধার ছিলাম। এই কালপর্বটা যেমন আমার জীবনে তেমনি আন্তর্জাতিক পৃথিবীতে এক যুগান্তকারী ইতিহাসের বার্তাবাহীরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। অবশ্য আমার সম্পাদকীয় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশও ঘটেছিল যুগান্তর পত্রিকায় এবং তারপর সাত বছর দৈনিক বসুমতির সম্পাদকরূপে। এরপর মালিক পক্ষের সঙ্গে নতুন বিরোধের জন্য বসুমতী থেকে কর্মচ্যুত হয়ে আমি জীবনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে ও পরামর্শে সত্যযুগ পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করলাম। যদিও জীবনলালকে আমি সর্বতোভাবে নানা প্রকার সাহায্য, উপদেশ ও ট্রেনিংয়ের দ্বারা সম্পাদক-রূপে গড়ে তুলেছিলাম এবং তাঁর জন্য প্রভূত লড়াইও করেছিলাম কিন্তু সত্যযুগ আমার প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হ'ল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত সত্যযুগের সঙ্গে আমার সম্পর্কেরও অবসান ঘটল।

দৈনিক বসুমতী পত্রিকা আমার সম্পাদনায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করার ফলে তখনকার দিনের মালিক খ্যাতনামা আইনবিদ অশোক সেনের দলবলের প্রচন্ড শঙ্কা এলো যে, কাগজটি একেবারে 'লাল' হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং

সম্পাদককে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদক হিসাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযানের পথে কাগজটার প্রচার সংখ্যা ৭ হাজার (তখন দৈনিক বসুমতী একেবারে নগন্য হয়ে গিয়েছিল) থেকে ১ লক্ষে গিয়ে পৌঁছলো এবং চারদিকে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। তখনকার দিনের খাদ্য আন্দোলনকে (মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন) কেন্দ্র করেই মূলত আমার অভিযান পরিচালিত হয়েছিল এবং এক এক কপি দৈনিক বসুমতীর দাম শহরে এক টাকা থেকে শুরু করে মফঃস্বলে পাঁচটাকা পর্যন্ত উঠেছিল। আজকের দিনে একথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু সেদিন এই অবিশ্বাস্য কান্ডই ঘটেছিল। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে 'অতুল্য-প্রফুল্ল' বধ হয়ে গেল এবং অভূতপূর্ব উত্তেজনায় সারা দেশ যেন কাঁপতে লাগলো। তখনই পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো এবং সেই ফ্রন্টে যেমন মন্ত্রিসভায় সি পি এম' এর জ্যোতিবাবুরা ছিলেন তেমনি ছিলেন কংগ্রেস থেকে অজয় মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। প্রধানতঃ আমারই ফর্মুলা অনুসারে এটা সম্ভব হয়েছিল। সেই ফর্মুলার মর্মকথা ছিল এই— 'Nationalist in form, Socialist in Content', অর্থাৎ আকৃতিতে জাতীয়তাবাদী, কিন্তু প্রকৃতিতে সমাজতন্ত্রী। এই ফর্মুলার কথা আমি প্রথম জেনেছিলাম ১৯৫৫ সালে আমার প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণের সময় উজবেকিস্তানের তাসখন্দ শহর পরিদর্শন উপলক্ষে। তাসখন্দ শহর নতুন করে নির্মাণের ও রূপায়ণের যিনি প্রধান ইঞ্জিনীয়ার ও স্থপতি ছিলেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এই শহর নির্মাণের পিছনে আপনাদের নতুন কী idea ছিল? উত্তরে তিনি আমাকে উপরোক্ত ফর্মুলার কথা বলেছিলেন। ১৯৬৬ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরাজয় ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময় আমার এই ফর্মুলার কথা মনে পড়ে গেল।

কিন্তু আজ সরলভাবেই স্বীকার করবো যে, কংগ্রেসের যে দু'জন বিশিষ্ট প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও চিন্তাধারা সম্পর্কে আমার ভুল ধারণার জন্যই শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙ্গে গেল। তবু একথা সত্য যে জ্যোতিবাবুরা সেই সর্বপ্রথম ক্যাবিনেটে ঢুকবার সুযোগ পেলেন এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে যথেষ্ট প্রভাব ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার সাংবাদিকতার সময় যে সমস্ত স্মরণীয় ঘটনাবলীর সমাবেশ হয়েছিল সেগুলির মধ্যে এখানে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

এই সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে আমার জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকার। সুধাকান্ত

রায়চৌধুরী ছিলেন সেই সময় সেই সমস্ত সাক্ষাতের ব্যবস্থাপক। সুধাকান্তবাবু অত্যন্ত বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে শোনা যায় যে তিনি নাকি বাঘের মাংসও খেয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অত্যন্ত উদার, অতিথিপরায়ণ এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও আমি সুধাকান্তবাবুর স্মরণ নিলাম। এই সাক্ষাতের তিনি যথা-যোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনে সেই প্রথম আমার শান্তিনিকেতনে গমন। শান্তিনিকেতনে তখন ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর প্রচণ্ড নামডাক। তিনি যেমন বিদ্যান ছিলেন তেমনি ছিলেন বাকপটু রসিক ব্যক্তি। জীবনে আমি আর একজন পণ্ডিতব্যক্তিকে এইরকম বাকপটু ও রসিক দেখেছি। তিনি হচ্ছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা গাছ-পালাওয়ালা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। কবি বিজয়লাল ক্ষিতিমোহনবাবুকে দেখতে পেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন—"এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়!" আমরা হেসে কুটিপাটি হলাম। ক্ষিতিমোহনবাবুর রসিকতা সম্পর্কে আমার আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন জামশেদপুরের সাকচি শহরে ডাক্তার ব্রহ্মপদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বছরে একটা করে সাহিত্য সম্মেলন হত। আমরা অনেকেই সেই সম্মেলনে যেতাম। মধ্যাহ্নভোজের পর সম্মেলনে দ্বিতীয় অধিবেশনে ক্ষিতিমোহনবাবুর বক্তৃতা দেওয়ার কথা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এই ধরনের বক্তৃতা দেওয়া বড় কঠিন।" এই মন্তব্য করেই তিনি শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশ্যে বলেন, "তাহলে একটা গল্প শুনুন। সে অনেককাল আগের কথা। তখন রোমের অ্যাম্পি থিয়েটারে সিংহের মুখে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নিক্ষেপ করা হোত। সম্রাট এবং বড় বড় ওমরাহ সিংহ কর্তৃক মানুষ ভক্ষণের এই হিংস্র দৃশ্যটি খুব উপভোগ করতেন। কিন্তু একদা দেখা গেল সিংহের সামনে নিক্ষিপ্ত মানুষটি দাঁড়িয়ে রইলেন। সিংহের কাছে আসতেই সেই মানুষটি তার কানে কানে কি বললেন, শুনে সিংহটি লেজ গুটিয়ে চলে গেল। তখন মঞ্চের চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। সম্রাট এবং তার পার্শ্বচররা অত্যন্ত উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কি ব্যাপার সিংহটা ঐভাবে চলে গেল কেন?" লোকটি জবাবে বলল, "কিছু না—আমি শুধু সিংহের কানে কানে একথা বলেছিলাম, "Look here Mr. Lion, you may eat me, but you have to make an after dinner speech." এই বক্তৃতা দেওয়ার ভয়েই সিংহ লেজ গুটিয়ে চলে গেল। ক্ষিতিমোহন সেনের গল্পে তুমুল হাসির রোল পড়ে গেল।

শান্তিনিকেতনের তখনকার দিনের বিখ্যাত শ্যামলী গৃহে (আসলে এটা

ছিল একটা পর্ণকুটীরের মত) আমাদের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটল। আমার ঘরে ঢুকতেই দেখি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বেতের মোড়ায় বসে। তিনি সেই মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আমরা গোড়াতেই তাঁর এই শিষ্টাচারে অভিভূত হ'লাম। আমি রবীন্দ্রনাথের পদ স্পর্শ করে তাঁকে প্রণাম করলাম, তিনি আস্তে আস্তে বললেন "আমার এ অশক্ত দেহ, তোমরা এসেছ দেখা করতে।" আমি যখন তাঁকে প্রণাম করলাম তখন লক্ষ্য করলাম তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলি যেন পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর। আমি মনে মনে ভাবলুম, অশক্ত দেহ সত্বেও কবির আঙুলের এই রং! হঠাৎ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি তো আনন্দবাজার থেকে এসেছ"? আমি বললুম "আজ্ঞে হ্যাঁ"—তিনি বললেন, তোমরা না স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে খুব বড়াই কর? তাহলে হিন্দুস্তান বীমা কোম্পানি ও নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাচ্ছ কেন? অকস্মাৎ এই প্রশ্নে আমি অত্যন্ত বিপাকে পড়লুম। কেননা প্রথমত আমি বীমা কোম্পানি সম্পর্কে কিছুই জানি না। এবং দ্বিতীয়ত আনন্দবাজার কর্তৃক হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে এই অভিযানে আমরা সমর্থক ছিলাম না। অথচ আমি আনন্দবাজারের পক্ষ থেকেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। সুতরাং আনন্দবাজারের মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য আমি কোন মতে বললুম, ' দেখুন বীমা কোম্পানির অডিট রিপোর্ট ভিত্তি করেই আনন্দবাজারে এ সংবাদ লেখা হয়েছে।" বলা বাহুল্য আমার এই উক্তিতে কবি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন, "তোমরা জান নলিনী এক কাপড়ে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছেছিল। কিন্তু তার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী গড়ে তুলেছে। আমি জানি সারা ভারতে বাঙ্গালীর এই ধরনের উদ্যমের বিরুদ্ধে কি প্রচন্ড বিরূপতা রয়েছে। আর তোমরা সেই বীমা কোম্পানির বিরুদ্ধে লেগেছ?" আমি সবিনয়ে ও অসংকোচ জবাব দিলুম "আপনার এই মতামত আনন্দবাজারের কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেব।"—এভাবে কোনভাবে আমি এ অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ থেকে রেহাই পেলাম।

সেবারে দুদিনে আমি প্রায় দেড় ঘন্টা রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারে কাটিয়েছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি এক সময়ে বললেন, "দেখ গভর্ণমেন্ট হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক। একবার আদালত থেকে জোড়াসাঁকোতে আমার নামে একটা সমন এসে উপস্থিত। অর্থাৎ আমাকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। আমি কিভাবে যাব কোথায় থাকব এসব নিয়ে সরকার পক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই। তারা সমন জারী করেই খালাস।" আমি হঠাৎ সাংবাদিকসুলভ মনোবৃত্তির ফলে জিজ্ঞেস করলাম, "এটা আপনার কোন বছরের ঘটনা?" রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন—"সময়ের হিসেব তো রাখি না; অনন্তকালের মধ্যে বাস করি।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অনুভব করলেন যে এই জবাবটা একটু বেশি কাব্যমণ্ডিত হয়ে গেল।

সুতরাং তিনি একটু সংশোধন করে বললেন, "তখন আমার 'চিত্রাঙ্গদা' লেখার বয়স।" রবীন্দ্রনাথের এই জবাব আমি কখনও ভুলব না। দু'দিনের সাক্ষাৎকারে তিনি অনেক বিষয়ের আলোচনা করেছিলেন যেগুলি আমার এখন স্মরণে নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাছে অসংখ্য-লোক চিঠি দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন এবং তাঁদের লেখা পুস্তক ইত্যাদি পাঠিয়ে দিতেন। আমি কিন্তু সারা জীবনেও এই কাজ করিনি। কেননা রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে ছিলেন বিরাট হিমালয়ের মতো অথবা বিরাট সমুদ্রের মতো। কিশোর বয়স থেকেই এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আমি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, অনুরক্ত এবং মুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের মতো সুমুদ্রের মতো মহান ব্যক্তিত্বের কাছে আমি কুয়োর ব্যাঙ মাত্র। আমি কিসের দাবিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাদ চাইতে যাব? এজন্য কোন দিনও উল্লেখ করিনি যে আমি কবিতা এবং সাহিত্যের চর্চা করি। শান্তিনিকেতনের পর জোড়া-সাঁকোতেও আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পায়ের ধুলো নিয়েছিলাম দোতলার ঘরে। তখন তিনি সহসা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি উত্তরপাড়ার মুখুজ্যেদের কেউ হও?" আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আজ্ঞে না।"

মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা নিয়েও অর্থাৎ তাঁর একটি বিশেষ কবিতার অর্থ নিয়ে লোকের প্রশ্নাদি আলোচনা করেছিলেন। তারপর তিনি আমাকে এক সময় বললেন, "দেখ, তোমরা খবরের কাগজের লোক। তোমাদের ভয় করি। সহজে কোন জিনিস তোমাদের পছন্দ হয় না। আজ রাত্রে সিংহসদনে বুড়োদের একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার আছে। তোমরা দেখতে যেও। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকদের একটা মিলিত অভিনয়।

আমি সন্ধ্যার পর যথারীতি সিংহসদনে গেলুম। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় দেখতে এলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর গায়ে ছিল মুগার পাঞ্জাবী। তিনি যখন দর্শকদের মধ্যে এসে বসলেন মনে হলো একজন সম্রাটের আবির্ভাব ঘটল। এমন অপূর্ব রূপ, এমন আভিজাত্যব্যঞ্জক চেহারা এবং সম্ভ্রমপূর্ণ ভঙ্গি আমি এর আগে আর কখনো দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের মতো দর্শকদের মধ্যে বসলেন। আমি অভিনয় দেখার বদলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে দেখছিলাম। এমন অপূর্ব রূপ আমি বর্ণনা করতেও অক্ষম। যাঁরা সেই রূপ দেখেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না একজন সত্যকার রূপবান কী অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হতে পারে। আমি সারাক্ষণ বসে বসে শুধু রবীন্দ্রনাথকেই দেখলুম। তিনি যখন সামনের দিকে তাকাতেন মনে হতো তাঁর চোখের আশ্চর্য দৃষ্টি দেওয়াল ভেদ করে রশ্মি বিকিরণ করছে। জাহাজ বা স্টীমারের রাত্রিবেলা যেমন সার্চ লাইট পড়ে, সেদিন রাত্রে মহাকবির দৃষ্টির মধ্যে আমি সেই সার্চ লাইটের আলো দেখেছিলাম। আমার জীবনে এই ঘটনা অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের

শিষ্টাচার, তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ—এ সমস্তের কোন তুলনা নেই।

এরই পাশাপাশি একটি বিপরীত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। একদিন অপরাহ্নে দক্ষিণ কলিকাতায় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আনন্দবাজারের পক্ষ থেকে একটি লেখার অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "কোত্থেকে এসেছ?" আমি বললুম, "আনন্দবাজার থেকে। তিনি তাচ্ছিল্য ভরে মন্তব্য করলেন, "কে পরাণ মজুমদার? না, তার কাগজে আমি কিছু লিখব না।" তিনি আর কোন বাক্যালাপই আমার সঙ্গে করলেন না। আমি কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। শরৎচন্দ্র বোধ হয় তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সংগে যুক্ত ছিলেন। সেই জন্যই 'পরাণ মজুমদারের' প্রতি এত উষ্মা কিনা জানি না।"

এই সময় আমি উত্তর কলিকাতায় বাস করতাম। সেখানে ছিল সজনীকান্ত দাসের বিখ্যাত শনিবারের চিঠির আড্ডা। সেই আড্ডায় নিরদ চৌধুরীর মতো অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তিরও আগমন ঘটত। তখন নীরদ চৌধুরীর Martial & Non-martial Race, Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবং সামরিক ব্যাপারে আমার আগ্রহের জন্য আমি এই প্রবন্ধের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে নীরদ চৌধুরীর কয়েকটি বিখ্যাত বই আমি পড়েছি, এবং তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য অভিভূত হয়েছি। আমি যখন শনিবারের চিঠিতে আড্ডা দিতাম তখন প্রমথ বিশী প্রমুখ বহু নাম করা সাহিত্যিক যাতায়াত করতেন। শনিবারের চিঠিতে সেইসময় আমার লেখা একটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তার শিরোনাম ছিল, "শেষ প্রশ্নের প্রথম জবাব", এই প্রবন্ধে আমি শরৎচন্দ্রের তীব্র ও তীক্ষ্ম সমালোচনা করেছিলাম, শুনেছি প্রবন্ধটি শরৎচন্দ্রেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বহুকাল পরে আমি যখন দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক তখন বিখ্যাত সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী (আমি যখন যুগান্তরের সম্পাদক তখন পরিমল গোস্বামী ম্যাগাজিন সেকসানের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন) সেই প্রবন্ধটি (শেষ প্রশ্নের প্রথম জবাব) উদ্ধার করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবং প্রবন্ধটির তিনি প্রশংসাও করেছিলেন। সাহিত্য বিষয়ে পরিমল গোস্বামীর যেমন পাণ্ডিত্য ছিল তেমনি ছিল তাঁর "Sense of humour", এই জন্য তিনি খুব জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান অনুশীলন সম্বন্ধে পরিমলবাবুর প্রবন্ধ খুব উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, মুখ্যমন্ত্রী হওরার আগেই ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকের নিয়ম কানুন পালনেও তিনি খুব সতর্ক ছিলেন এবং এখানে দু-একটি কাহিনী সেই বিষয়ে উল্লেখ

করতে পারি। আমি একদিন ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে বললুম—আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জামশেদপুরে আছেন, তাঁর ছুটির খুব দরকার। কিন্তু ডাক্তারের সার্টিফিকেট ছাড়া কোম্পানি (টাটা) ছুটি দেবে না, আপনি যদি আমার ভ্রাতাকে দেখে এক লাইন লিখে দেন, তবে অনায়াসেই তাঁর মাসখানেক ছুটি হতে পারে।

তখন ডাঃ রায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এভাবে চিকিৎসকরা নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেন না। কতগুলি ethics তাঁদের মানতেই হবে। তবে, কি জানো, সব নিয়মেরই exception বা ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সেটা একমাত্র জরুরী ক্ষেত্রে বা জীবন বাঁচাবার প্রশ্নে।

এই বলে তিনি আমাকে একটা আশ্চর্য কাহিনী বললেন, সেটা আজও ভুলিনি। ডাঃ রায় বললেন—সুভাষচন্দ্র তখন বর্মার একটা জেলে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তাঁকে ইউরোপের ভিয়েনায় পাঠানো দরকার চিকিৎসার জন্য। তখনকার বৃটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রকে জনমতের চাপে পড়ে কলিকাতার প্রিন্সেপঘাটের জাহাজে চাপালেন ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য। সুভাষচন্দ্রকে পরীক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটা মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করলেন নিম্নলিখিত বিখ্যাত ডাক্তারদের নিয়ে।

১। কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটি (সরকার পক্ষে)
২। স্যার নীলরতন সরকার (জনসাধারণ বা পাব্লিকের পক্ষে) এবং
৩। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (কংগ্রেসের পক্ষে)

সিনিয়র হিসাবে স্যার নীলরতন হলেন এই মেডিক্যাল টীমের নেতা। তিনি সুভাষচন্দ্রকে পরীক্ষা করে এবং তাঁর বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ে ডাঃ বিধান রায়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—

এই জায়গার sound কি সন্দেহজনক নয় ?

ডাঃ বিধান রায়ও কিছুটা পরীক্ষা করে স্যার নীলরতনের দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, সন্দেহজনক বৈকি।

তখন কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইট দেখলেন—স্যার নীলরতন সরকারের সাথে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একমত হয়েছেন। এই অবস্থায় যদি ডেনহ্যাম হোয়াইট ভিন্নমত পোষণ করেন, তবে, ব্যাপারটা গুরুতর রাজনৈতিক রূপ ধারণ করতে পারে এবং প্রচার হতে পারে যে, গবর্ণমেণ্টকে খুশি করবার জন্যই তিনি এভাবে ভিন্নমত দিয়েছেন। সুতরাং কর্ণেল ডেনহ্যাম হোয়াইটও মেডিক্যাল রিপোর্টে একমত হ'য়ে স্বাক্ষর দিলেন এবং সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যেতে সমর্থ হলেন।

ডাঃ রায় এই কাহিনী আমাকে বলেই মন্তব্য করলেন—খুব ঐতিহাসিক দায়িত্বের ক্ষেত্রেই চিকিৎসকরা কিছু কিছু ব্যতিক্রম করতে পারেন, সাধারণ ব্যাপারে নয়।

আমার জীবন সংগ্রাম ও পৃথিবীব্যাপী মহাসংগ্রাম এই দুইয়েরই পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল যুগান্তর পত্রিকায় আমার পঁচিশ বছরের সম্পাদকীয় কার্যাবলীর মধ্যে। এই গোটা কালপর্বটাই একটানা সংগ্রামের কাহিনীমাত্র।

এখানে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত আমার জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী থেকে ভূমিকার প্রয়োজনীয় অংশটি উদ্ধৃতি করছি। সেই অংশটি এই—

"গোড়াতেই বালক বয়সের একটা স্মৃতির কথা লিখিতেছি। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় গ্রামে দেখিতাম সংবাদপত্র পাইয়া দস্তুরমতো একটা বৈঠক বসিত। তখন দৈনিক পত্রিকার গ্রামাঞ্চলে চল ছিল না। সাপ্তাহিক 'হিতবাণী' কিংবা 'বসুমতী' যাইত। সেই প্রকাণ্ড কাগজখানা পাটির মত বিছাইয়া দেওয়া হইত—উহার চারিদিকে পাঁচ ছয়জন লোক বসিতেন এবং একজন গভীর মন দিয়া পড়িয়া বাকি পাঁচজনকে শুনাইতেন এবং আবশ্যক মত বুঝাইয়া দিতেন। যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ জানিবার ও বুঝিবার জন্য লোকের অপরিসীম আগ্রহ লক্ষ্য করিতাম। যদিও আমি সেই সময় নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলাম তথাপি বয়স্কদের বৈঠকে এক কোণে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া নিতান্ত কৌতূহলের সহিত জার্মান যুদ্ধের আলোচনা শুনিতাম। সেই দূর অতীতের স্মৃতি সন্ধান করিলে আজো মনে পড়ে এন্টোয়ার দুর্গের পতনে সেই ক্ষুদ্র বৈঠকের চাঞ্চল্য। জার্মানরা "কাঁটা তাঁরের বেড়া ডিঙ্গাইতেছে" এই গোছের একটা ছবিও বাহির হইয়াছিল। এবং সেই ছবিটা আমার বালক চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছিল। ১৯১৮ সালের পর একে একে ২০ বছর কাটিয়া গিয়াছে। আমি আর সংবাদপত্রের গ্রাম্য পাঠক নহি। এক্ষণে আমার নিজের স্কন্ধেই একখানা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার পড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যখন এই মহাযুদ্ধ বাধিল তখন মনে পড়িয়া গেল আমার ছোট বেলার সেই গ্রাম্য বৈঠকের কথা—এই যুদ্ধ বুঝিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে। সম্পাদক হিসাবে যুগান্তর মারফৎ আমি সেই গ্রাম্য ভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। কল্পনা করিলাম আমার চারিদিকে উৎসুক পাঠকের জনতা—তাহাদিগকে এই মহাযুদ্ধের নীতি, প্রকৃতি এবং রণবিজ্ঞানের অসংখ্য অজ্ঞাত তথ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। ১৯১৪-১৯১৮ সালের তুলনায় বর্তমানে দেশ আন্তর্জাতিক শিক্ষায় ও আলোচনায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পাঠক সমাজের এই পরিবর্তন আমি প্রতিদিন অনুভব করিলাম। নিতান্ত সরলভাবে স্বীকার করিতে পারি যে আজিকের দিনের পাঠককে ফাঁকি দেওয়া সহজ কাজ নহে, গোঁজামিল দিয়া কোন জিনিস বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, কিংবা কেবল উচ্ছ্বাসের দ্বারাই পাঠকের চিত্ত জয় করা যায় না। তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধান আসিয়াছে—অন্তত

যুগান্তর মারফৎ আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে। দেশব্যাপী এবং সংবাদপত্র উভয়ের কাছে ইহা প্রকান্ড লাভ।

"আধুনিক যুদ্ধ বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য স্বভাবতই আমাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়া ও জাপানের বহু খ্যাতনামা রণপন্ডিতের পুস্তকের এবং স্বদেশী ও বিদেশী নানা পত্রিকায় বিশেষজ্ঞদের রচনা, তথ্য, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অবিরত সাহায্য লইতে হইয়াছে। এমন দিনও গিয়াছে যখন, যুগান্তরের একটি মাত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য আমাকে ক্রমাগত ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এবং সেই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহের জন্য তিন চারিদিন খাটিতে হইয়াছে। কেবল মাত্র সামরিক ইতিহাসের দিক হইতে ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনা ইতিপূর্বে এই দেশে হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না এবং বর্তমান কালেও বাংলা ও ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে একমাত্র বোম্বাইয়ের Times of India ছাড়া আর কোন কাগজে এই ধরনের ধারাবাহিক অলোচনা দেখি নাই।"

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আমার কিশোর বয়সে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। এবং তখন থেকেই আমি রণবিদ্যা ও রণনীতি সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে উঠেছিলাম। আর আমি সংবাদপত্রে যোগ দেওয়ার পর থেকে যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা যেন আমার পিছু পিছু ধাওয়া করতে লাগল। এই সময় উত্তর কলিকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে আমি যখন থাকতাম তখন আজকেব দিনের সুবিখ্যাত এবং অগাধ বিদ্যার অধিকারী ও ইংরাজী ভাষার অদ্বিতীয় পন্ডিত নীরদচন্দ্র চৌধুরী (Nirad C. Chowdhury) সেই অঞ্চলে থাকতেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাসের শনিবারের চিঠিরও আড্ডা ওখানকার একমাত্র গলিতে ছিল। আমি কাছাকাছি থাকতাম বলে প্রায়শই শনিবারের চিঠিব আড্ডায় যাতায়াত করতাম। তখন সেখানে কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর আনাগোনা ছিল। নীরদচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সামরিক শাস্ত্রে নীরদবাবুর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। এবং কোন বিষয়ে যে নেই তা বলা বড় কঠিন। রণবিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, উদ্ভিদবিদ্যা থেকে শুরু করে ক্যাকটাস ও বিভিন্ন প্রকারের সুরা ও পানীয় সম্পর্কেও তাঁর আশ্চর্য জ্ঞান ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে তিনি ছিলেন দিল্লিতে এবং তখন তিনি রেডিওতে যুদ্ধের খবরের ভাষ্যকার ছিলেন। আমি দিল্লিতে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে গেলাম। কারণ আমি বরাবরই তাঁর অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলাম। তাঁর বিদ্যাবত্তার মত তাঁর স্মরণ শক্তিও অসাধারণ। ১৯৮২ সালে আমার জেষ্ঠ্যা কন্যা ও তাঁর স্বামী যখন ইংল্যান্ডে গিয়ে Oxford-এ নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন নীরদ চৌধুরী তখন Oxford-এ বিশ্ব-

বিখ্যাত Maxmullar-এর জীবনীগ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমার মেয়ে-জামাই আমার কথা নীরদবাবুর কাছে উল্লেখ করেন। নীরদবাবু তখন যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে জানা যায় যে, আমার কথা তাঁর দস্তুরমত মনে আছে। তিরিশের দশকে এই নীরদ চৌধুরী যখন শনিবারের চিঠিতে আসতেন তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরেজী মাসিকপত্র Modern Review-তে নীরদ চৌধুরীর Martial & Non-martial Races of India নামে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। আমি তখন থেকেই নীরদবাবুর রচনাবলীর অত্যন্ত সমজদার পাঠক ছিলাম। নীরদবাবুর বিদ্যাবত্তা যে কতদিকে প্রসারিত ছিল তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে দিল্লিতে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়) তখন তিনি সেখানে একটি অত্যন্ত সাধারণ ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতেন। আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে তাঁর স্ত্রীকে নীরদবাবু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার পরিচয় দিতেই তিনি ছাদের দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে সেখানে যেতে বললেন। আমি তখন দেখলুম নীরদবাবু একটি ফতুয়া গায়ে দিয়ে ঝারি হাতে টবে জল দিচ্ছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললেন, 'আসুন, বিবেকানন্দবাবু'। আমি তাঁকে বললুম, 'কি, গাছের সেবা করছেন ?' নীরদবাবু বললেন, 'হ্যাঁ দেখুন না, গাছেরও ভীষণ মর্জি আছে। এই যে ক্যাকটাস্ দেখছেন এর আমি যত্ন করছি, কিন্তু ভয়ানক মেজাজী গাছ। ক্যাকটাস্ সম্পর্কে পড়াশোনার জন্য আমি জার্মানী থেকে অনেক টাকা দিয়ে তিন ভল্যুম বই আনিয়েছি।' শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

তারপর আমরা দুজনে তাঁর পাঠকক্ষে গেলাম এবং সেখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এমন সব কথা বললেন যেগুলো শুনে তাঁর বিদ্যাবত্তা সম্পর্কে আমার যেন নতুন করে চোখ খুলে গেল। ১৯৮৫ সালে আমি দিল্লিতে গিয়ে নীরদবাবুর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি থেকে নীরদবাবুর কয়েকখানা বিখ্যাত ইংরাজী বই পড়তে এনেছিলাম। এবং সেগুলির মধ্যে ম্যাক্সমুলারের জীবনী গ্রন্থও ছিল। এ সমস্ত বইয়ের উপর চোখ বুলালেই বোঝা যাবে নীরদ চৌধুরীর পাণ্ডিত্য কত অগাধ বিস্তৃত। প্রথম যৌবনে আমি তাঁর সংস্পর্শে এসে রণবিদ্যা সম্পর্কে আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। এবং যুগান্তরের সম্পাদক রূপে একাদিক্রমে পঁচিশ বছর ধরে আমি যে লেখনী চালনা করেছিলাম তাতে সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকাল পর্যন্ত আমার আলোচ্য বিষয় ছিল। এইজন্য সেইসময় আমার যথেষ্ট নামও ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ মহাযুদ্ধের গতিপথে আমি যে সমস্ত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করতাম এবং আমার লেখার ভিতরে যে সমস্ত forecast থাকত সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ফলে যেত। যেমন বিশ্ব

বিখ্যাত সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের পতন কিম্বা উত্তর আফ্রিকার মরুভূমি যুদ্ধের মায়াবী জেনারেল রোমেলের পরাজয় ও পশ্চাদাপসরণ।

এই সমস্ত ঘটনার সময় সজনীকান্ত দাসের বিখ্যাত 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রিকায় মন্তব্য বিভাগে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে লেখা হল—যুগান্তরের যুদ্ধ-সংক্রান্ত ফলাফলগুলি পড়ে মনে হয় যেন লর্ড ওয়েভেলের ভাগ্নে সেখানে বসে আছেন।

যুগান্তরের সম্পাদক রূপে দুর্ভাগ্যক্রমে আমার প্রথম সংঘাত ঘটলো এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে, যাঁকে আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতাম এবং যিনি আমাকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন। কেবল তাই নয়, অনেক বিপদ থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করেছেন এবং দুঃসময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মত উদার মানুষ এবং মহানুভব চরিত্রের লোক আমি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়টি দেখিনি। তাঁর নাম ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী ও বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তাঁর সততা ও চরিত্রবল ছিল অনন্যসাধারণ। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি তাঁর গাড়ি অফিসের কাজে ছাড়া অন্য কোন উপলক্ষে ব্যবহার করতেন না, এমনকি নিজের ভগ্নীকেও তিনি সেই গাড়ীতে চড়তে দিতেন না। সেই সময় উত্তর কলিকাতার একটি তেল কলে কিছু ভেজাল জিনিস ধরা পড়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী রূপে ডঃ ঘোষ কড়া ব্যবস্থা নিলেন—অবশ্য আইন অনুসারে। কিন্তু দিল্লির কর্তারা ও মাড়োয়ারী সমাজের মাতব্বর ব্যক্তিরা এতে ক্ষিপ্ত হলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁরা দিল্লিকে ধরাধরি করলেন এবং দিল্লির কর্তারা সুপারিশ করলেন মাড়োয়ারী সমাজের কোন কংগ্রেস ভক্তকে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভায় গ্রহণের জন্য। শোনা গেল গান্ধীজীও মাড়োয়ারীদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁর সম্মতি দিলেন। কিন্তু ডঃ ঘোষ কঠিন লোক ছিলেন এবং তাঁর নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত বিশুদ্ধ ছিল। সুতরাং তাঁদের অনুরোধ ও সুপারিশ ডঃ ঘোষ উপেক্ষা করলেন। তখন ডঃ ঘোষকে অপসারণ পূর্বক বিধানচন্দ্র রায়কে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাবার শলাপরামর্শ হলো। আমি সেটা জানতে পেরে 'উপরের তলার চক্রান্ত' শীর্ষক একটি গরম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে ইংরেজী দৈনিক Advance পত্রিকায় তার একটি ইংরেজী অনুবাদ 'Conspiracy in the upper chamber' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্যাস, তাতেই যেন আগুন জ্বলে উঠলো।

তখন আমি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাসায়। সকালে আমার ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমি টেলিফোনটা ধরতেই ওপ্রান্ত থেকে কণ্ঠস্বর কিছুটা গম্ভীর ভাবে ধ্বনিত হলো—আমি বিধানচন্দ্র রায় বলছি—'ক্যাপ্টেন নরেন কোথায় ?'

আমি কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'কেন, ক্যাপ্টেন নরেন দত্তকে চাইছেন কেন?'

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন বেঙ্গল ইমিউনিটির স্বনামধন্য স্থাপয়িতা এবং রাজনৈতিক সূত্রে ডাঃ রায় থেকে শুরু করে, নলিনী-রঞ্জন সরকার, কিরণশঙ্কর রায়, তুষারকান্তি ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন সুভাষবিরোধী এবং জে এম সেনগুপ্তের কিম্বা গান্ধী-চক্রের পক্ষপাতী। এই দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বিরোধের ফলে অমৃতবাজার পত্রিকার আশ্রয়ে প্রথম দৈনিক যুগান্তরের সৃষ্টি হলো; তখন ক্যাপ্টেন দত্ত ছিলেন যুগান্তর পরিচালকমণ্ডলীর কিম্বা ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান। সুতরাং 'সরকারীভাবে' আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

ডাঃ রায় আমার প্রশ্নের জবাবে বললেন—নরেনকে খুঁজছি তোমাদের যুগান্তর এখন কে দেখাশোনা করে জানবার জন্য।'

আমি বললুম—'কেন, আমি যতক্ষণ সম্পাদক পদে আছি, তখন আমিই দেখাশোনা করি।'

ডাঃ রায় যেন কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে বললেন—'ও কথা ছেড়ে দাও, অনেক সম্পাদক দেখেছি।'

আমি আহত কণ্ঠে এবং কিছু ঝাঁঝালো সুরে জবাব দিলুম, 'আপনি অনেক সম্পাদক দেখে থাকতে পারেন, কিন্তু আপনি বিবেকানন্দ মুখুজ্যেকে দেখেন নি।' আমি আরও উত্তেজিত ভাবে বললুম—'দেখুন ডাঃ রায়, আমি যখন রোগী হয়ে আপনার কাছে যাবো, তখন নিশ্চয়ই আপনার কথা শিরোধার্য করবো। কিন্তু আপাততঃ আপনি ডাক্তার হিসাবে কথা বলছেন না, কিম্বা আমি আপনার ভিটেমাটির প্রজাও নই। আপনি কথা বলছেন যুগান্তর সম্পর্কে, যুগান্তরের সম্পাদকের সঙ্গে, অতএব সেভাবেই আপনার কথা বলা উচিত।'

আমি তখন নিতান্তই তরুণ মাত্র। সুতরাং সহজেই দাহ্যশীল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বোধহয় জীবনে কল্পনাও করেননি যে, একজন 'ছোকরা' এভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান ছিলেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত নরম করে কিছু স্নেহার্দ্র সুরে বললেন—'ওহে, বিবেকানন্দ, চটে যাচ্ছো কেন? উপরের তলার চক্রান্ত-টক্রান্ত কিছু নয়। তুমি এসো বিকেলে আমার কাছে। ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে দেব।'

আমিও সম্মতিসূচক জবাব দিলুম—'যাবো, ডাঃ রায় আপনার কাছে।'

ডাঃ রায়ের এই অপ্রত্যাশিত টেলিফোনের পর যিনি আমাকে ফোন করলেন, তাঁর নাম কিরণশঙ্কর রায়। তিনি অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিদ্রূপরসিক।

তিনি ফোন করে বললেন—'কি বিবেকানন্দবাবু, আজকাল কি সর্বত্রই চক্রান্ত দেখছেন ? ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের বিরুদ্ধে আমরা চক্রান্ত করবো কেন ?'

আমি জবাব দিলুম, 'কেন চক্রান্ত করবেন, সেটা তো সোজা। তাঁকে সরিয়ে আপনাদের পছন্দমত লোক নিতে চান।'

কিরণবাবু আরও দু'চারটি চিমটিকাটা মন্তব্যের পর থেমে গেলেন।

এরপর যিনি ফোন করলেন, তিনি স্বয়ং তুষারকান্তি ঘোষ। যুগান্তরের খোদ মালিক।

পর পর এই সমস্ত টেলিফোনের ফলে আমি তখন খুব চটে গেছি, আমি খুব তিক্ত স্বরে বলে ফেললুম—

দেখুন তুষারবাবু, যুগান্তরের দীপ আমিই জেলেছি। দরকার হলে আমি এক ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেব। তবু, আপনাদের এই মাতব্বরি সহ্য করবো না।

আমার জবাব শুনে তুষারবাবু টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

এই নাটকীয় ঘটনার সময় আমার আবাল্য সুহৃদ হরেন ঘটক বোধহয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের কথাবার্তা শুনে তাঁর মুখও খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

অবশ্য হরেন ঘটক আমার সমানবয়সী। কিন্তু তাঁর শক্তি, স্বাস্থ্য ও সাহসের সঙ্গে আমার কোন তুলনাই হয় না। শিশু ও কিশোরদের জন্য ছড়া রচনায় এবং শিশু সাহিত্যের সম্পাদনার ব্যাপারে তিনি আজও (১৯৮৬ সালে) পশ্চিমবঙ্গে অদ্বিতীয়। এমন আশ্চর্য দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তি আমার সমবয়সীদের মধ্যে আর কাউকে দেখিনি। তবু সেদিনের—ডাঃ বিধান রায়, কিরণশঙ্কর রায় এবং তুষারকান্তি ঘোষ—পর পর এই তিন জনের টেলিফোন ও আমার জবাব শুনে বোধহয় হরেনেরও কিছুটা উদ্বেগ হয়েছিল।

কিন্তু সেকথা যাক। আমি বোধহয় সন্ধ্যার দিকে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সেই বিখ্যাত গৃহে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে—যেখানে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারত বিখ্যাত নেতারা আসতেন পরামর্শ করতেন এবং আতিথ্য গ্রহণ করতেন, সেখানে গেলুম। শুনেছি ডাঃ রায় পায়েস খেতে খুব ভালোবাসতেন এবং একদিন জওহরলালকেও পায়েস (পরমান্ন) খাইয়ে খুশি করেছিলেন।

ডাঃ রায় জওহরলালকেও 'তুমি' (জহর) বলে সম্বোধন করতেন এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, ডাঃ বিধান রায়ের মত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (যার তুলনা সেদিনের ভারতে ছিল না) পুরুষের কাছে সকলেই 'তুমি' পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। আর থাকবেন না কেন ? চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ বিধান রায় তো ধন্বন্তরি ছিলেন এবং তিনি জওহরলালের পিতা মতিলাল নেহরু, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারত বরেণ্য নেতাদের চিকিৎসক ছিলেন। আর কংগ্রেসের একজন স্তম্ভ ছিলেন।

এমন ব্যক্তির সঙ্গে আমার মত একজন সামান্য লোকের সংঘাত ঘটে গেল। ভাবালে এখন কেমন বিচিত্র কৌতুক বোধ হয়। কিন্তু ডাঃ রায় ছিলেন সত্যি সত্যি অসাধারণ মানুষ।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের (বর্তমানে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) তাঁর সেই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গৃহে গেলে তিনি আমার মত একজন সামান্য 'বালককে' সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাঁর গৃহের সুপরিচিত লাইব্রেরী কক্ষে সেদিন থেকে শুরু হলো আমার নিয়মিত সাক্ষাৎ ও আড্ডা।

ইতিমধ্যে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ অপসারিত হলেন এবং তাঁর স্থানে মুখ্যমন্ত্রী রূপে গদিতে অধিষ্ঠিত হলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। যিনি পূর্বেই উত্তর প্রদেশের গভর্নরের পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু যুগান্তর পত্রিকায় যোগদানের অনেক আগে থাকতেই। এমন কি, যখন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছিলুম তখন থেকেই। সেই সময় আনন্দবাজারের সঙ্গে আমাদের বনিবনা হচ্ছিল না। আমরা অন্য একটা কাগজ করা সম্ভব কিনা, সেকথা ভাবছিলুম। সত্যেনদা একদিন ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। কারণ, ফরোয়ার্ড পত্রিকার জন্য ডাঃ রায়ের সংবাদপত্র সম্পর্কে অনেকটা অভিজ্ঞতা ছিল। আমি ও সত্যেনদা একদিন বিকেলে ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। নতুন পত্রিকার সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনার পর আমার মনে আছে তিনি চিড়ে ভাজা ইত্যাদি দিয়ে আমাদের জলযোগে আপ্যায়িত করলেন এবং সত্যেনদার জন্য এক টিন দামী সিগারেট আনালেন। আমরা আলোচনা শেষে যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখন ডাঃ রায় বলেন—'সত্যেন, তোমার সিগারেটটা ফেলে গেলে। এই কৌটোটা তোমার, আমি এ দিয়ে কি করবো ?'

সত্যেনদা ডাঃ রায়ের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে বললেন—'ডাঃ রায়, আপনি যদি সিগারেট খেতেন তবে, কি করে আর এত দামি বাক্স সিগারেট আনতেন ? মাত্র একটি সিগারেট এনে আমাকে দিতেন। চায়ের পর একটি সিগারেটই যথেষ্ট।'

হাসতে হাসতে আমরা ডাঃ রায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। বলা বাহুল্য যে নতুন কাগজের পরিকল্পনা বাস্তবে সম্ভব হলো না। সেই থেকে, বোধহয় ১৯৩৭-৩৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ডাঃ রায় যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ডাঃ রায়ের কতকগুলি অসামান্য গুণ, উদারতা ও মহানুভবতা ছিল। যেমন, তাঁর মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও ধনী-দরিদ্র বিভেদ ছিল না। তেমনি তাঁর স্মরণশক্তিও ছিল অনন্যসাধারণ। দার্শনিক

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ যেমন তাঁর স্মৃতিশক্তির দিক থেকে অসামান্য ছিলেন (বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়ের আত্মকথা—'তরী হতে তীর' পুস্তক দ্রষ্টব্য) তেমনি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিশক্তিও বিস্ময়কর ছিল। আমার মনে পড়ে ডাঃ রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন পি এস মাথুর ছিলেন পঃ বঙ্গ সরকারের বার্তাবিভাগ ও লোকরঞ্জন বিভাগের অধিকর্তা। একদিন ডাঃ রায় দমদম বিমানবন্দরে প্লেনে ওঠবার আগে মাথুরকে বললেন—অমুক আলমারির অমুক তাকে এত নম্বর ফাইলটা খুঁজে দেখে অমুককে একটা পত্র লিখে দাও।

মাথুর আমাকে নিজে ওই ঘটনাটা উল্লেখ করে বলেছিলেন, এমন আশ্চর্য স্মৃতিশক্তির মানুষ আমি আর দেখিনি।

১৯৪০ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে হিটলারের বিদ্যুৎগতি জয়ের পর মে-জুন মাসে আমি যখন দার্জিলিংয়ে গেলাম তখন সন্ধ্যাবেলা ম্যালে পরিভ্রমণের সময় স্বনামধন্য ব্যারিস্টার মিঃ এন সি চ্যাটার্জি আমাকে দেখতে পেয়েই কাছে ডাকলেন। এবং আমি কাছে যেতেই তিনি বেঞ্চির উপর উপবিষ্ট বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে বললেন,—"ডঃ মজুমদার, যদি যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু জানতে চান তবে যুগান্তর এবং স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা পড়বেন। কারণ যুগান্তরে যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক ভাল বিশ্লেষণ থাকে।"

জীবনের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আরও অগ্রসর হওয়ার আগে কাশীতে সুরেশ চক্রবর্তীর (আমাদের প্রিয় সুরেশদা) উল্লেখ করা একান্ত দরকার।

উত্তরা কাগজের সম্পাদক ও পরিচালক সুরেশ চক্রবর্তীর কাশীর বাড়ীটা যেন ছিল সেদিনের বাঙালী সাহিত্যিকদের একটা তীর্থক্ষেত্র। ভেলুপুরা অঞ্চলে একটা পুরানো দোতলা রঙচটা বাড়ী বাইরে থেকে দেখলে কোনই আকর্ষণ অনুভব করা যায় না। কিন্তু সুরেশদাকে সাহিত্য-প্রেমিক এমন কি 'সাহিত্য-পাগল' বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। এখানে একটি ছোট্ট প্রেস করে গরীবানা ভাবে সুরেশদা তার উত্তরা মাসিক কাগজ সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। উত্তর ভারতে সেই সময় বাঙালী মণীষার যেন নক্ষত্ররাজি ফুটে উঠেছিল। বিখ্যাত সঙ্গীতকার অতুলপ্রসাদ সেন, যাঁর আশ্চর্য সঙ্গীত আজও টিভিতে ও রেডিওতে আমরা শুনে থাকি, তিনি ছিলেন লক্ষ্ণৌয়ের বাসিন্দা—পেশা ছিল ব্যারিস্টারি। তিনি এত জনপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর নামে লক্ষ্ণৌতে একটি রাস্তারও নামকরণ হয়েছে। এছাড়া এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রবাসী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—এই তিন মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন উজ্জ্বল

জ্যোতিষ্কের মত। সঙ্গীত, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনে এঁদের মণীষার রশ্মি উত্তর-পশ্চিম ভারতের লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস থেকে শুরু করে কলিকাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ওদিকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তো ছিলেনই। বোধহয় সেটা বাঙালী মণীষার স্বর্ণযুগ গিয়েছে। কাশীর সুরেশদা ছিলেন এঁদের ঘনিষ্ঠ সহচর ও সাহিত্য চর্চার অংশীদার।

সুরেশ চক্রবর্তীর এই কাশীর বাড়িতে বাংলার ধুরন্ধর সাহিত্যিকদের অনেকেরই পদার্পণ ঘটেছে এবং তাঁরা সরল, ভাবপ্রবণ ও আত্মভোলা সুরেশদার আতিথ্য গ্রহণ করে তৃপ্তি লাভ করেছেন। বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), প্রবোধকুমার সান্যাল থেকে শুরু করে সেই যুগের অনেক সাহিত্যিক পূজার সময় কাশীতে মিলিত হতেন। (প্রবোধকুমার সান্যাল অবশ্য একদা বেনারসেরই বাসিন্দা ছিলেন)। ব্যক্তিগতভাবে আমিও সুরেশদার খুব অনুরক্ত ছিলুম। তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা আকর্ষণ ছিল এবং সাধারণতঃ পূজো বা শারদীয়া সংখ্যা বের করার আগে তিনি একবার কলকাতায় আসতেন ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতেন লেখা সংগ্রহের জন্য।

উত্তরার জন্য তিনি ছিলেন উৎকর্গীকৃতপ্রাণ। বলা বাহুল্য যে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে অভাব অনটনের মধ্যেই তিনি জীবন কাটাতেন এবং উত্তরাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বলা যেতে পারে উত্তর ভারতে বাংলা সাহিত্যের জন্য উত্তরার সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী একজন শহিদ!

আমি বেশ কয়েকবার বারাণসীতে গিয়ে সুরেশদার গৃহে অবস্থান করেছিলাম। আর রাত্রিবেলা তাঁর ছাদের ঘরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তর ভারতের কমলালেবু থেকে তৈরি 'সান্তারা' পানীয় সেবন করে এক অভিনব নেশায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম। একবার বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক হরেন ঘটকও আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন।

উত্তরার জন্য সুরেশদা যে সংগ্রাম করেছেন তা' আমাদের মত বন্ধুজনের কাছে অবিস্মরণীয়।

১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে কিংবা ইং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে উত্তরার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র রূপে। সম্পাদক অতুলপ্রসাদ সেন ও ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। সহযোগী সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তী।

কিন্তু ক্রমে কাগজ চালাবার অনেক ঝামেলা দেখে একে একে এঁরা প্রায় সকলেই দায়িত্ব ছেড়ে দেন। তখন একা সুরেশ চক্রবর্তী ব্যক্তিগতভাবে উত্তরার সমস্ত পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে এই কাগজ পরিচালনা করেছিলেন। ছাপার ভুলশূন্য কাগজ প্রকাশ এযুগে যেমন, সেযুগেও তেমনি কঠিন ছিল।

কিন্তু সুরেশদা এবিষয়েও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উত্তরাতে ছাপার ভুল ঘটতো না। নিজেরাই কম্পোজ করতেন এবং একটি প্রেস থেকে ছেপে আনতেন। এভাবে সুরেশ চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের জন্য তপস্যা করে গেছেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও অন্যতম সেরা প্রবাসী বাঙালী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার লালগোপাল মুখোপাধ্যায়, স্বনামধন্য সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তিরা সুরেশদার এই প্রচেষ্টাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এই পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রবাসী বাঙালীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তো খুব বিস্ময় প্রকাশ করে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, তিনি এলাহাবাদ থেকে 'প্রবাসী' প্রথম বের করেছিলেন, কিন্তু টিকিয়ে রাখা কঠিন দেখে কলিকাতায় এসে প্রবাসী বের করতে থাকেন। কিন্তু সুরেশ চক্রবর্তী কিভাবে এতদিন উত্তরাকে চালাচ্ছেন? শুনেছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সুরেশদার এই সাহিত্য কর্মের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন—যদিও সাহিত্য জগতে মতবাদের ওঠানামায় (যেমন কল্লোল গ্রুপ সাহিত্যে আধুনিকতা ইত্যাদি) সুরেশ চক্রবর্তীকেও নাজেহাল হতে হয়েছিল।

সেদিনের সেই পত্রে তিনি লিখেছিলেন—"বাংলা সাহিত্যের জন্য কি করেছি না করেছি, জানি না—তবে তোমার চিঠিতে মাঝে মাঝে যে প্রশস্তি ভেসে আসে, তাতে মনে হয় হয়তো বা কিছু করে থাকবো।

কিন্তু সে প্রত্যাশা কদিনের? কিছুদিনের মধ্যেই আমি তোমাদের কাছে মৃত, তারপরেই ত 'ফসিল্'। তবু যদি তুমি কিছু বন্ধুকৃত্য করতে উৎসাহ বোধ কর—তবে তুমি নিজে কিছু লিখ। তোমার সময় কম, তবু তারই মধ্যে যদি সময় করে আমার সম্বন্ধে লেখ, তা আমার জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।"

আজ এতদিন পরে পরিষ্কার মনে পড়ে না সুরেশদার জীবিতকালে কিছু লিখেছিলাম কিনা। তিনি ৭০ এর দশকের শেষ দিকে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কাশীতে তাঁর বাড়িতেই দেহত্যাগ করেন। আমরা তাঁর অনুগামীরা শোকাহত হয়েছিলাম।

সেদিনের কাশী ছিল অতি বিখ্যাত ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম শহর। এই শহরের অনতিদূরবর্তী ভগবান বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিমণ্ডিত সারনাথ এবং সেখানে জাপানী ও সিংহলী বৌদ্ধদের সহযোগিতায় ও অনাগরিক ধর্মপালের জীবনপণ

চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধবিহার ও স্মৃতিসৌধ। কিন্তু কাশী বিখ্যাত ছিল বাঙালীদের কাছে নানা কারণে। অত্যন্ত সস্তার জায়গা ছিল কাশী, অনাথা ও বিধবারা সেখানে আশ্রয় পেত। মাত্র মাসে পাঁচ টাকায় একজন বিধবার জীবন নির্বাহ হতো। সেজন্য সেদিনের বহু বিধবা সেখানে যেতো। কিছু কিছু যৌন বিকৃতিও ঘটতো। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত শহরেই এবং সমস্ত যুগেই যৌন ব্যাপারটা গোলমেলে। অতএব কোন নির্দিষ্ট শহরের দুর্নাম রটনা করা উচিত নয়।

কাশীর বাঙালীটোলা ছিল বাঙালী বাসিন্দাদের সবচেয়ে বড় এলাকা। আর দুর্গাপূজার ছুটিতে কাশীতে প্রচণ্ড ভিড় হতো—সাহিত্যিক থেকে শুরু করে তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণবিলাসীদের। বিশ্বনাথের মন্দির ভারত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। কাশীতে বাঙালী সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ভিড়ের কিন্তু অন্যতম মূল আকর্ষণ ছিল উত্তরার সুরেশ চক্রবর্তী। সুরেশদার মুখে যেন অজস্র কথার খৈ ফুটতো। আমার মনে পড়ে একবার বালীগঞ্জে কবি রাধারাণীদেবী ও নরেন দেবের গৃহে সুরেশদা ও রাধারাণীদেবী এমন কথাবার্তায় মেতে উঠলেন যে, মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পার হয়ে গেল! কাশীতে বিখ্যাত কলা ও চিত্র সমালোচক অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী রণদা উকীল ও বরদা উকীল ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁরা ইন্ডিয়া হাউজ পেইন্ট করার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, এই সমস্ত গুণী ব্যক্তির সঙ্গে সুরেশদার যোগাযোগ ছিল এবং আমিও কাশীতে গেলে এই সমস্ত যোগাযোগ ঘটতো—অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের (ও. সি. গাঙ্গুলী) সঙ্গে তো আমার একাধিক দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল।

গোড়ার দিকে সুরেশদার বাড়িতে গিয়ে সকালে গঙ্গাস্নান করতে যেতাম। এখানে সেই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। সুরেশদার বাড়ির একটি ছেলেকে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়েছি, এমন সময় সেই ছেলেটির পরিচিত আর একটি ছোট্ট ছেলে এলো, বছর নয়েক বয়স। বড় ছেলেটি সেই ছোট ছেলেটিকে বললো আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে— "জানিস কে এসেছে স্নান করতে? তোরা তো যুগান্তর পড়িস, সেই পত্রিকার সম্পাদক—অমুক নামে এসেছে স্নান করার জন্য।"

ছোট ছেলেটি বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বড় ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলো অত্যন্ত নরম ও শান্ত স্বরে—"হ্যাঁরে, কি খায়রে?"

অর্থাৎ শিশুজনোচিত কৌতূহলের মধ্যে একটা বড় জিজ্ঞাসা লুকানো ছিল —"বিখ্যাত লোকেরাও কি আমাদের মত শুধু ডাল ভাত খায়?"

আমি এই তাৎপর্যব্যঞ্জক ছোট্ট ঘটনাটা আজও ভুলিনি।

সুরেশ চক্রবর্তী ও উত্তরার প্রসঙ্গেব এখানেই ইতি টেনে আমি আবার আমার আগেকার স্মৃতিচারণে ফিরে যাই।

আগেই লিখেছি বটে যে, মহাযুদ্ধের গতিপথে অবস্থা ক্রমেই জটিল ও ঘোরালো হয়ে উঠছে এবং ভেবেছিলাম মিঃ পোর্টারের সঙ্গে আমার সংঘাত কমে এলো। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটলো না। আমার ওপর সেদিনের বাংলার বৃটিশ শাসকদের বিরূপতা পুরোপুরি বজায় রইলো। যুদ্ধে শত্রুর হঠাৎ কোন আক্রমণের আশঙ্কায় দক্ষিণবঙ্গের তীরভূমি থেকে ভারত রক্ষার জরুরী আইন বলে evacuation policy অনুসৃত হলো। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের বিরোধ লেগেই ছিল। কংগ্রেস এ প্রকার evacuation policy-এর তীব্র নিন্দা করলো। কারণ, নির্দোষ ও গরীব জনসাধারণকে এভাবে বাসভূমি থেকে উচ্ছেদের জন্য তাদের অপরিসীম কষ্ট হতো। আমি এই বিষয়টিতে কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করে যুগান্তরে লিখেছিলাম। ফলে গভর্নমেণ্ট ভারত রক্ষা আইন অনুসারে যুগান্তর প্রকাশ বন্ধ করে দিল। আমরা একেবারে স্তম্ভিত। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বোধহয় শিলং কিম্বা অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে শিয়ালদহ স্টেশনে নামতেই আমার এক আত্মীয় যুবকের মুখে যুগান্তরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কথা শুনলেন। আমিও টেলিফোনে ডাঃ রায়ের আগমনের কথা শুনে রাতে তাঁর ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গৃহে গেলাম। যতদূর মনে পড়ে আমি ডাঃ রায়ের সুবৃহৎ ড্রয়িংরুমের একটা পাশের ঘরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। তিনি কংগ্রেসের একজন গণ্যমান্য নেতা। আমার মুখে ঘটনাটা শুনে স্বভাবতই গভর্নমেণ্টের উপর বিরক্ত হলেন। রাত তখন ৯টা। তিনি গভর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারি মিঃ ব্র্যাডিকে (অবশ্য নামটা আমার পুরো মনে নেই) ফোন করলেন। সাহেবের আর্দালি ফোনে জবাব দিল, সাহেব এখন ঘুমুতে গেছে, তাকে ডাকতে পারবো না। ডাঃ রায় বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'সাহেবকে বলো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় টেলিফোনে ডাকছেন।'

ডাঃ রায়ের নামের এমনি মহিমা ছিল যে, সাহেব তৎক্ষণাৎ বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ডাঃ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন এবং সব শুনে ডাঃ রায়কে জানালেন যে, এই হুকুমের কথা তিনি কিছু জানেন না। এটা করেছেন হোম সেক্রেটারি মিঃ পোর্টার। সুতরাং তার সঙ্গেই যোগাযোগ করা উচিত।

আগেই বলেছি যে, মিঃ পোর্টার ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দক্ষ আই-সি-এস অফিসার। এমন কি, সেদিন তিনি কার্যত বাংলার defacto গভর্নর ছিলেন। শুনেছি তিনি এমন নোট দিতেন যে কারুর সাধ্য ছিল না সেটা খণ্ডন বা অমান্য করার।

যা হোক ডাঃ রায় যুগান্তরের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার জন্য অনুরোধ করে মিঃ পোর্টারকে কংগ্রেসের নীতি ব্যাখ্যা করে বুঝালেন এবং evacuation policy-এর জন্য কিভাবে জনগণের দুর্দশা ঘটে সেটাও ব্যাখ্যা করলেন। যুগান্তর দেশের স্বার্থে সেকথা লিখেছিল। অতএব অপরাধ

যুগান্তরের নয়। যা লেখা হয়েছে, তা কংগ্রেসের নীতির প্রতিধ্বনী মাত্র। এভাবে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাকে ও যুগান্তরকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত করলেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো। সন্ধ্যার দিকে তিনি বিনা পয়সায় রোগী দেখতেন। কত গুরুতর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির যে উপকার করতেন তার ইয়ত্তা নেই। চিকিৎসক হিসেবে তিনিতো প্রায় ধন্বন্তরি তুল্য ছিলেন। সুতরাং অনেক ডাক্তার তাঁর কাছে রোগী পাঠাতেন, কিম্বা কখনও কখনও নিজেরাও নিয়ে যেতেন।

এসব কাজ হয়ে গেলে তাঁর সাথে আমি নিভৃত আড্ডায় যোগ দিতাম। আশ্চর্য এই যে, আমি বয়সে কত ছোট এবং তার তুলনায় একজন নগণ্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনখোলা কথাবার্তা কিছুই আটকাতো না।

আমি একদিন ডাঃ রায়কে আমার একটি বেকার আত্মীয় ছেলের চাকুরির জন্য বললাম। বলা বাহুল্য যে, বেকার সমস্যা আমাদের দেশে চিরকালই প্রবল—সেই দূরবর্তী বৃটিশ আমল থেকে আজ স্বাধীনতার ৪৩ বছর পর্যন্ত। তখন ডাঃ রায় আমাকে বললেন, ওহে চাকুরি দেওয়া খুব কঠিন কাজ। তবে, শোন, তোমাকে একটা গল্প বলি। জাস্টিস দ্বারিকা মিত্তিরের নাম শুনেছতো? তিনি তখন হাইকোর্ট থেকে retire (অবসর) করেছেন। তাঁর বাড়িতে তাঁর নাতিকে পড়াবার জন্য প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। সেই ভদ্রলোক একদিন জাস্টিস মিত্রকে বললেন, স্যার হাইকোর্টে একটি কেরানীর চাকুরী খালি আছে। আপনি একটু recommend করলেই চাকুরিটা পেতে পারি। জাস্টিস মিত্র বললেন, 'নাহে, এখন আমার পরিচিতিতে কোন কাজ হবে না। আমি তো আর জজের পদে নেই। কিন্তু প্রাইভেট টিউটর ভদ্রলোকের দৃঢ়বিশ্বাস জাস্টিস মিত্র সুপারিশ করলেই তার চাকুরি হবে। অবশ্য হাইকোর্টের জজদের সমাজে অপরিসীম মর্যাদা ছিল। সুতরাং সেই ভদ্রলোকের বিশ্বাস ভিত্তিহীন ছিল না। অতএব তিনি খুব ধরে পড়লেন। তখন জাস্টিস মিত্র সেই প্রাইভেট টিউটরকে একটা সুপারিশপত্র দিলেন। সেই ভদ্রলোক সুপারিশ চিঠি নিয়ে হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু সেই আবেদন অগ্রাহ্য হলো।

জাস্টিস মিত্র একদিন ভদ্রলোককে তাঁর চাকুরির কি হলো জিজ্ঞাসা করলেন। ভদ্রলোক খুব বিনীতভাবে জানালেন—'আপনি তো যথেষ্ট দয়া করেছিলেন। কিন্তু চাকুরিটা হলো না'।

তখন জাস্টিস মিত্র বললেন, তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, আমি আর ঐ পদে নেই, কাজেই সুপারিশিতে কোন কাজ হবে না।

এর কিছুকাল পরে সেই টিউটর ভদ্রলোক আবার জাস্টিস মিত্রকে বললেন, —স্যার আর একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি যদি দয়া করে একটু সুপারিশ করেন।

জাস্টিস মিত্র কঠিন সুরে বললেন—'না হে, আর না। দেখলে তো আমাদের কথায় কোন কাজ হয় না।'

কিন্তু টিউটর ভদ্রলোক অনেক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—গরীব মানুষ, আমার খুব উপকার হতো।

তখন জাস্টিস মিত্র আবার সুপারিশ পত্র দিলেন এবং এবারও সেই ভদ্র-লোকের আবেদন আগের বারের মতই প্রত্যাখাত হলো।

জাস্টিস মিত্র যথারীতি ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যের কথা শুনলেন এবং বললেন—তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, আমি আর ক্ষমতায় নেই। সুতরাং এখন আর কেউ মানে না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে তৃতীয়বার আর একটি পোস্ট খালি হলো এবং সেই টিউটর ভদ্রলোক আবার প্রার্থী হলেন। জাস্টিস মিত্রকে তিনি এবারও ধরলেন এবং বহু অনুনয় বিনয় করে বললেন—'তৃতীয়বারেও যদি কিছু না হয়, তবে, আর আপনাকে বিরক্ত করবো না'।

যাহোক জাস্টিক মিত্র ভদ্রলোকের উপর দয়া পরবশ হয়ে আবার সুপারিশপত্র দিলেন। কিন্তু এবারও তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলো।

বারবার তিনবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে জাস্টিস মিত্রের অভিমানে খুব লাগলো। তিনি প্রাইভেট টিউটরের মুখে সব শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ দ্বারোয়ানকে ডেকে গাড়ি (তখনকার দিনে ঘোড়ার গাড়ি) বের করতে বললেন।

জাস্টিস মিত্র সেই গাড়ি করে সোজা রেজিস্ট্রারের বাড়িতে গিয়ে হাজির। রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক জাস্টিস দ্বারিকা মিত্রের অকস্মাৎ এমন আগমনে খুব বিস্মিত ও কৌতুহলাক্রান্ত হলেন।

তখন মিত্তির সাহেব রেজিস্ট্রারকে বললেন—'আমি আর হাইকোর্টে জজের পদে নেই বলে আপনি এভাবে বার বার তিনবার আমার সুপারিশপত্র অগ্রাহ্য করে একজন গরীব মানুষকে কেরানীর চাকুরিটা দিলেন না, এটা কেমন সুবিবেচনা ?'

তখন রেজিস্ট্রার ভদ্রলোক খুব দুঃখ প্রকাশ করে এবং ক্ষমা চেয়ে সেই টিউটর ভদ্রলোককে চাকুরিতে নিয়োগ পত্র দিলেন।.......

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমাকে এই বিচিত্র কাহিনীটি বলে মন্তব্য করলেন—'যদি এই ধরনের কোন অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি করতে পার তা'হলে তোমার বেকার আত্মীয়ের চাকুরি হতে পারে।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার / জার্মানি কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণ এবং ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে হাতে কলমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। চেম্বারলেনও দালাদিয়েরের কুখ্যাত তোষণ নীতি ও শান্তি রক্ষার নাম করে মহাযুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ কি ভূমিকা নেবে, এই প্রশ্ন স্বতঃই মুখ্য হয়ে উঠলো। ভারত সেই সময় স্বাধীন সরকারের অধিকার পেলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য দিতে উৎসুক ছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার দাবি, এমন কি যুদ্ধের পরেও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কোন প্রতিশ্রুতি দিতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন অস্বীকৃত হলো। এমন কি মহাযুদ্ধের গতিপথে যখন জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণ অত্যাসন্ন হয়ে উঠলো, তখন সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক ভারতের স্বাধিকার লাভের প্রশ্নটি উত্থিত হলে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল রূঢ়ভাবে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি যা বলেছিলেন, তার বাংলা মর্ম এই "সাম্রাজ্যের কারবারে লালবাতি জ্বালাবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীত্ব নেইনি।"

এই রূঢ় উত্তরে জাতীয়তাবাদী ভারত যেমন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তেমনি যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভারত রক্ষা আইন বা ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলস্ জারি হলো, তাতেও ভারতকে যেন জরুরী আইনের নাগপাশে বন্দী করে ফেলা হলো। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই এই সমস্ত বিধি-বিধান জারি হলো এবং লাট-বেলাটরা সর্বময় স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী হলেন। যুদ্ধের আগে যেটুকু অধিকার ছিল ভারতবাসীর, সেটুকুও কেড়ে নেওয়া হলো।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধ ও রণ নীতি সম্পর্কে আমার আগ্রহ ও কৌতূহল ছিল অপরিসীম এবং সেই সঙ্গে ছিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছা-চারিতার প্রতি তীব্র অসন্তোষ। সুতরাং এই দুই মনোভাবের সংমিশ্রিত চাপা অসন্তোষ লেখার কৌশলে প্রতিফলিত হতো আমার সেই সময়কার প্রবন্ধগুলিতে। অর্থাৎ যুগান্তর-এর সম্পাদকীয় রচনাবলীতে। ফলে, যুগান্তর অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সেই সময় অখণ্ড বাংলা সরকারেব স্বরাষ্ট্র (হোম) বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন মিঃ পোর্টার (Porter), আই সি এস এবং তাঁর সহকারী ছিলেন মিঃ এ বি চ্যাটার্জি, আই সি এস। মিঃ পোর্টার অত্যন্ত চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। অধিকন্তু তিনি বাংলা ভাষাও শিখেছিলেন। শুনেছি ইংলণ্ডে তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির (Harold Lasky) তিনি ছিলেন class-mate,

অর্থাৎ দু'জনে একই ক্লাসের ছাত্র ছিলেন, পোর্টার ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে ভারতে চলে এলেন চাকুরি নিয়ে। কিন্তু অধ্যাপক ল্যাস্কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়েই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। অন্যথা পোর্টারও সম্ভবত আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হতেন।

মহাযুদ্ধের শুরুতেই যুগান্তরে আমার লেখা নিয়ে হোম সেক্রেটারি মিঃ পোর্টারের সঙ্গে আমার সংঘাত আরম্ভ হলো। ভারত রক্ষা আইন অনুসারে আমার বিরুদ্ধে কয়েকবার ওয়ার্নিং বা সতর্কীকরণের নোটিসও এলো এবং আইন-বিশেষজ্ঞ মিঃ এন সি চ্যাটার্জি সেগুলির জবাব রচনায় আমাকে প্রভূত সাহায্য দিয়েছিলেন।

এজন্যই পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের লোকসভা নির্বাচন পর্বে মিঃ এন সি চ্যাটার্জি যখন বামপন্থী দলগুলির সমর্থনে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট প্রার্থীরূপে বর্ধমান কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি তখন সানন্দে তাঁর পক্ষে কতকগুলি প্রচার কার্যে যোগদান ও বক্তৃতা দিয়েছিলাম—যদিও নীতিগত ভাবে আমি কখনও নির্বাচনে কোন প্রার্থীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলি না। মিঃ চ্যাটার্জি সেবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে এমপি-র আসন দখল করেছিলেন।

১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মিঃ পোর্টারের সঙ্গে আমার সংঘাত বাধলো 'জাহাজের জহরব্রত' শীর্ষক চাঞ্চল্যকর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য।

১৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯, দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে রাজ্যের দক্ষিণ অতলান্তিক ও প্লেট নদীর সঙ্গমস্থলে মণ্টেভিডো বন্দরের অদূরে যে রোমহর্ষক নৌযুদ্ধ হয়েছিল, সেটিকে কেন্দ্র করেই মিঃ পোর্টারের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ হয়েছিল। জার্মানির বিখ্যাত পকেট ব্যাটলশিপ (অর্থাৎ ক্ষুদে যুদ্ধ জাহাজ) 'এডমিরাল গ্রাফ স্পী' তার বিস্ময়কর বিক্রমে এবং বৃটিশপক্ষীয় বাণিজ্য জাহাজ-গুলির ভরাডুবি ঘটানোর ব্যাপারে নৌপথে এমন সন্ত্রাসের সৃষ্টি করলো যে, বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। অবশেষে তিনখানা বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ (অ্যাজাক্স, অ্যাক্সিটার ও অ্যাকিলিস্) দক্ষিণ আমেরিকার মণ্টেভিডো বন্দরের দিকে গ্রাফ স্পীকে তাড়া করে নিয়ে গেল এবং গ্রাফ স্পী সেই নিরপেক্ষ বন্দরে আশ্রয় নিল। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধরত পক্ষের যুদ্ধজাহাজ গ্রাফ স্পীকে বন্দর ছেড়ে আসতেই হবে। সেই 'শুভক্ষণটি'র অপেক্ষায় ৪ মাইল দূরে দক্ষিণ অতলান্তিকের বক্ষে সতর্ক পাহারায় দাঁড়িয়ে রইলো ৩টি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ। ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৯, গ্রাফ স্পীর ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ দেখতে পেলেন যে, বন্দরের বহির্গমনেরও পলায়নের পথ শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত। সুতরাং পরিণাম ভয়ংকর। তখন বার্লিন থেকে হিটলারের আদেশে গ্রাফ স্পীর আত্মনিমজ্জনের সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু জার্মান নৌবহরের গর্ব ও গৌরবের এই বিখ্যাত ক্ষুদে যুদ্ধজাহাজের আত্মনিমজ্জনের শোকে ও

অবমাননায় ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্ফ আত্মহত্যার দ্বারা জীবনের অবসান ঘটালেন। আমি এই নাটকীয় ঘটনাটিকে অবলম্বন করেই সেকালের রাজপুত নারীরা শত্রুর হাতে অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে জহরব্রত পালন করতেন, অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দিতেন, গ্রাফ স্পী ও ল্যাংসডর্ফের ঘটনাটি সেভাবে চিত্রিত করেছিলাম। ফলে, মিঃ পোর্টার চটে লাল হলেন, অথচ আমার বর্ণনা সত্য ঘটনাগুলিকে কোথাও অতিক্রম করেনি। ফলে, আইনের দিক থেকে কোন মতেই আমাকে দণ্ড দেওয়ার সুযোগ ছিল না। মিঃ পোর্টার রাইটার্স বিল্ডিংসে আমাকে ডেকে রাগত সুরে বললেন যে, তুমি কৌশলে শত্রুপক্ষের প্রশংসা করেছ। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে long term view নেওয়া দরকার। আমি সোজাসুজি জবাব দিলুম—যা সত্য, তাই লিখেছি এবং জার্মানির উদ্দেশ্যে কোন প্রশংসা করিনি।

এভাবে বেশ কয়েকমাস আমার যুদ্ধ সংক্রান্ত লেখাগুলি নিয়ে মিঃ পোর্টারের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলো। শেষ পর্যন্ত একদিন মিঃ পোর্টার তুষারকান্তি ঘোষকে ডেকে আমার সম্পর্কে বললেন—He is the most dangerous editor. He is always on the border line, so we can not catch him in law. So, I suggest that Dr. Dhiren Sen be appointed as editor of Jugantar in place Mr. Mukherjee.

তুষারবাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং কৌশলী। তিনি জানেন এমন অবস্থায় কিভাবে জোড়াতালি দিয়ে চলতে হয়। বোধহয় তিনি সাহেবকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তিনি একটা ব্যবস্থা করবেন। এদিকে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, যিনি তখন অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক এবং আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও বামপন্থী মতবাদের দিক থেকে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ছিলেন, তিনি মিঃ পোর্টারের প্রস্তাবকে অবজ্ঞা ভরে উড়িয়েই দিলেন।

তারপর মহাযুদ্ধের গতিপথে অবস্থা ক্রমেই আরও জটিল এবং ঘোরালো হয়ে উঠলো এবং আমার সঙ্গে মিঃ পোর্টারের সংঘাতও কমে গেল। এখানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা সরকারের বৃটিশ কর্তাদের সঙ্গে সেদিন আমার সম্পাদকীয় জীবনের ঝড়ো দিনগুলিতে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ও মিঃ পোর্টারের সহকারী মিঃ এ বি চ্যাটার্জী, আই সি এস, যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য দিয়েছিলেন ও রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন।

উত্তর আফ্রিকায় ফিল্ড মার্শাল রোমেলের অবিশ্বাস্য পরাজয়ের সংবাদে ব্যারিস্টার মিঃ বসুর দাম্ভিকতা অনেকখানি চুপসে গেল এবং আমার সম্পর্কে বেশ নরমভাব নিলেন। প্রাতঃভ্রমণের সময় (দেশবন্ধু পার্কে) তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি এমন একটা ফলাফল বুঝতে পারলে কি করে ?' আমি জবাবে বললুম—'আপনারা শুধু একপক্ষের বক্তব্যের উপর নির্ভর করেন। আমি মন

দিয়ে সমস্ত খবর, বিশেষভাবে, নিরপেক্ষ দেশগুলির সূত্রে প্রাপ্ত খবরগুলি গভীরভাবে পড়ি। এবং তাছাড়া রণবিজ্ঞান ও যুদ্ধ সম্পর্কে আমি দিনরাত পড়াশুনো করি।....

তারপরে ব্যাপারটা আমি কিছু কিছু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলুম। বোসসাহেব খুব সন্তুষ্ট না হলেও মোটামুটি মেনে নিলেন।

এখানে সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের পতন ও উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল রোমেলের পরাজয় সম্পর্কে কি ভাবে Correct forecast (সঠিক পূর্বাভাস) দিতে পেরেছিলাম সেটা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

মনে রাখা দরকার সিঙ্গাপুর নৌদুর্গ সেদিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মালয় উপদ্বীপের শেষ প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের প্রায় সংযোগস্থলে দণ্ডায়মান ছিল। নৌদুর্গ বহু শত শত কোটি কোটি টাকা খরচ করে দুর্ভেদ্য রূপে পড়ে তোলা হয়েছিল। পূর্বদিকে প্রধানত জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার দুর্ভেদ্য ব্যূহরূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। জাপান কর্তৃক পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিদ্যুৎ গতি জয় ও অগ্রগতির ফলে সারা এশিয়াখণ্ডে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। কিন্তু সকলেই বলতে লাগল—যতই জাপান জয় লাভ করুক না কেন সিঙ্গাপুর এসে তারা খুব বিপদে পড়বে। ওখানকার ব্রিটিশ নৌদুর্গ তাদের সমস্ত অগ্রগতি চূর্ণ করে দেবে। কিন্তু আমি দিনের পর দিন জাপানের আক্রমণ ও অগ্রগতি সম্পর্কে সমস্ত খবর গভীর মন দিয়ে পড়তে লাগলুম। মনে রাখা দরকার সেই সময় জাপানকে প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দু'টি যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং 'রিপালস' (একটি ৩৫ হাজার টনের এবং অন্যটি ৩২ হাজার টনের) অকস্মাৎ জাপানীদের বিমান আক্রমণে ধ্বংস হয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল। এই ভীমকায় যুদ্ধ জাহাজ দুটি প্রতিরক্ষার বিমান পাহারা ছাড়াই মালয়ের সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। জাপানীরা টের পেয়ে অকস্মাৎ বিমান আক্রমণের দ্বারা সেদুটি ডুবিয়ে দিল। এই ঘটনায় ব্রিটিশ মহলে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিষম চাঞ্চল্য ঘটে গেল। অধিকন্তু দেখা গেল জাপানী সৈন্যরা মালয় উপদ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই পার্শ্বদেশে অবতরণ করেছিল। ইন্দোচীন ও থাইল্যান্ড আগেই জাপানীরা দখল করে নিয়েছিল। সুতরাং তারা উত্তরদিক থেকেও মালয়ে দক্ষিণ প্রান্তের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের এই সমস্ত অগ্রগতি ঘটল প্রায় নিঃশব্দে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। এই সময়েই সংবাদপত্রে প্রথম যুদ্ধ সংক্রান্ত বিবরণে Infiltration অর্থাৎ অনুপ্রবেশ শব্দটি আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। জাপানীদের অনুপ্রবেশের এই রণকৌশলটি প্রায় অঘটন ঘটিয়ে দিল। কারণ, তারা পিছন দিক থেকে সিঙ্গাপুরে এসে হাজির হল। অথচ দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুর দুর্গের সমস্ত কিছু সামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল সম্মুখের বা প্রশান্ত মহাসাগরের

দিকে। পিছন থেকে এই অভাবনীয় এবং অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সিঙ্গাপুরের দুর্গরক্ষীরা হতভম্ব হয়ে গেল। কারণ তাদের সামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থাগুলি কোন কাজেই এল না। সুতরাং তারা অতি দ্রুত আত্মসমর্পণে বাধ্য হল।

আমি উপরে বর্ণিত এই সামরিক অবস্থার সমস্ত আভাসই পেয়েছিলাম সেদিনের বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টগুলি থেকে। আমি এই রিপোর্টগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অনুসরণ করতাম। সুতরাং রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কে যাঁদের কিছুটা পড়াশুনা আছে তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই অবস্থায় সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা। রণকৌশলের দিক থেকে জাপানীদের এই চাতুর্য ছিল অসাধারণ। সুতরাং সিঙ্গাপুরের নৌদুর্গ সম্পর্কে আমি যে সঠিক পূর্বাভাষ দিতে পেরেছিলাম তার আসল কারণ ছিল এইখানে।

এক্ষণে উত্তর আফ্রিকায় মরুভূমি যুদ্ধে যাদুকর জেনারেল রোমেলের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ করছি। আগেই বলেছি যে, জেনারেল রোমেল প্রায় বিদ্যুৎগতি যুদ্ধের দ্বারা উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির সমস্ত ঘাঁটি একে একে দখল করে সুয়েজ খাল ও আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু সুয়েজ খাল যদি সত্যি সত্যিই ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের (ইতালী-জার্মান শক্তিবর্গের) দখলে চলে যায় তবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যু অনিবার্য। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রী মিঃ চার্চিল একথা ভাল করেই জানতেন। কারণ মিঃ চার্চিল যদিও ভারতবিদ্বেষী নিদারুণ রক্ষণশীল নেতা ও সাম্রাজ্যপ্রেমিক ছিলেন তবু তিনি ছিলেন যুদ্ধ, রণনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সেদিনের পৃথিবীর একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

সুতরাং তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পূর্বদিকে জাপান এবং পশ্চিমে জার্মানী যদি ভারত আক্রমণের জন্য এগিয়ে যায় তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আর রক্ষা নেই। সেইজন্য তিনি জার্মানীকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নেই সতর্ক হলেন। অর্থাৎ ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে সুয়েজ খালের দিকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ছয়মাস ধরে গোপনে প্রস্তুতি চালালেন। যতরকম ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও কামান ইত্যাদি জমায়েত করা সম্ভব তারই ব্যবস্থা করা হল আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের কাছে। আফ্রিকার অভ্যন্তর দিয়ে এই সমস্ত সমরসম্ভার গোপনে আনা হয়েছিল। সেই সময়ে ভূমধ্যসাগরের উপরেও ব্রিটিশ নৌবহরের কর্তৃত্ব ছিল। আর এদিকে হিটলার তখন স্ট্যালিনগ্রাদ অভিযানের জন্য নিদারুণভাবে মেতে উঠেছিলেন। কাজেই উত্তর আফ্রিকা, রোমেল এবং ভূমধ্যসাগর ইত্যাদি হিটলারী উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে উপেক্ষিত হল। এদিকে বহু যুদ্ধে পর পর পরাজয় বরণ করে ব্রিটিশ শক্তি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সুয়েজ খাল ও আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর রক্ষার জন্য ব্রিটিশপক্ষের প্রধান সেনাপতি

নিযুক্ত হলেন একজন পাদ্রীর / ছেলে নাম মণ্টগোমারি। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, স্থিরমস্তিষ্ক ও রণকৌশলবিশারদ ছিলেন। তিনি ব্রিটিশপক্ষের সমস্ত শক্তি দিয়ে এল আলামিয়েন রণক্ষেত্রে রোমেলের উপর আঘাত হানলেন। এবং এই আঘাতও হানা হল প্রথমে প্রকাণ্ড একটা ধাপ্পাবাজি ঘটিয়ে। অর্থাৎ একটা কৃত্রিম রণক্ষেত্রের সাজান যুদ্ধ ঘটিয়ে। রোমেলের শক্তি সেখানে অনেকখানি ক্ষয়ে যাবার পর মণ্টগোমারি যে আসল আঘাত হানলেন রোমেল তাতে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন।

আমি সেদিনকার নানা সংবাদ বিশ্লেষণ করে, বিশেষতঃ, নিরপেক্ষ দেশগুলির বিভিন্ন কূটনৈতিক মহল থেকে প্রচারিত গুজব, গবেষণা ও অনুমানভিত্তিক সংবাদ বিশ্লেষণ করে উপরে বর্ণিত এই চিত্রটার অনেকখানি আভাস পেলাম। পর্তুগাল, স্পেন, জেনেভা, স্টকহোম প্রভৃতি রাজধানীর কূটনৈতিক সূত্র থেকে অনেক প্রকার গবেষণা সেন্সরের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও প্রকাশিত হত। এই সমস্ত অনুধাবন করেই আমার পক্ষে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং এরমধ্যে কোন আজগুবি ব্যাপার ছিল না।

১৯৪১ সালের জুন মাসে হিটলারী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের ফলে নাৎসী জার্মানীর যে পরাজয় ঘটবে একথা পৃথিবীর বহু মনীষী অনুমান করতে পেরেছিলেন।

কারণ, বিপ্লবী লেনিন প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রেড আর্মি ও জনগণের শক্তি সম্পর্কে অনেক দূরদর্শী মানুষই সচেতন ছিলেন। এমনকি স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুশয্যা থেকেও এই আশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে রাশিয়ার জয় হবে।

আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, অন্তত ৪০/৪৫ বছর ধরে, এমন কী ১৯৩৬ সালে মুসোলিনীর ইটালী কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের পর থেকেই আমি যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে যথাসম্ভব অধ্যায়ন করে আসছি। এই যুদ্ধের ব্যাপারে আমি অনেকখানি সহায়তা পেয়েছিলাম আমার পরলোকগত সহকর্মী ও মানচিত্র বিশারদ অনিল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতার ফলে। আমরা দুজনে মিলে দিনের পর দিন সকালবেলা মানচিত্রের সাহায্যে যুদ্ধের অগ্রগতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করতাম। সেদিনের বাংলাদেশে সামরিক মানচিত্র অঙ্কনে অনিল মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেহ। যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি বোঝার পক্ষে অনিল মখোপাধ্যায়ের আঁকা মানচিত্রগুলি খুব সহায়ক ছিল।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, রোমেলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের পরে মণ্টগোমারিকে পরবর্তীকালে 'লর্ড" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল।

মহাযুদ্ধ এগিয়ে যেতে লাগলো এবং নাৎসী-ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের ক্রমাগত জয়লাভ সেদিনের মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে সংকটকালের সৃষ্টি করলো। একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার রণাঙ্গনে জার্মানির বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিরোধ দেখা দিল, কিন্তু তাতে জার্মানির অগ্রগতি তেমন প্রতিহত হলো না। এদিকে সারা ভারতের জাগ্রত জনমত মিত্রশক্তির পক্ষে ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে। কিন্তু চার্চিলের নেতৃত্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের টুঁটি চেপে রেখেছিল এবং ভারতকে কিছুতেই স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি হলো না। অথচ ভারতের স্বাধীনতাকামী জনমত ক্রমশই সোচ্চার হতে লাগলো। পূর্বদিক থেকে জাপানী জঙ্গীবাদকে প্রতিহত করার জন্য ভারতের মৈত্রী ও স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন, একথা চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা জেনারেল চিয়াং কাইসেক (যিনি মিত্রপক্ষের অন্যতম অংশীদার ছিলেন) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উপলব্ধি করলেন। চিয়াং কাইসেক এইসময় একবার ভারতে এসে তেমন ভরসাও দিয়ে গেলেন এবং রুজভেল্টের দূতও অনুরূপ আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সাম্রাজ্যপ্রেমিক উইনস্টোন চার্চিল এক ইঞ্চি নড়তেও রাজি হলেন না।

ভারতবর্ষে চাপা বিক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আসছিল অনেক দিন ধরে এবং ১৯৩০-এর দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনের তরঙ্গ একটির পর আর একটি উদ্বেলিত হয়ে আসছিল—১৯২০-২১ সাল থেকে যার শুরু। ক্রমে ১৯৪২-এর জুলাই-আগস্ট মাসের সেই কালপর্ব এসে গেল, যেটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

বোম্বাই শহরে আগস্ট মাসে জাতীয় কংগ্রেসের এ আই সি সি-র অধিবেশন আহূত হলো। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে আমি যুগান্তর-এর পক্ষ থেকে এবং ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন অমৃতবাজারের পক্ষ থেকে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হলাম। কিন্তু বোম্বাইগামী ট্রেনের খবর নিয়ে জানা গেল যে, তিলধারণের স্থান নেই। মুস্কিল, কিন্তু এই মুশকিল আসান হবে কিরূপে? এমন সময় 'মুশকিল আসান'-রূপে দেখা দিলেন সেদিনের সুবিখ্যাত পঙ্কজ গুপ্ত, যিনি আজও ক্রীড়াজগতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

পঙ্কজ গুপ্তের জন্ম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে (মৃত্যু ১৯৭১) দক্ষিণ বিক্রমপুর—পূর্ববঙ্গে। তিনি বি-এ পাশ করার পর স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে আই এফ এ প্রশাসনে যোগদান করেন এবং নিজের প্রতিভা, কৃতিত্ব ও শক্তির বলে ধাপে ধাপে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেন। তিনি প্রথমে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জাভা সফরকারী আই এফ এ দলের ম্যানেজার থেকে ক্রমে পৃথিবীর

সমস্ত দেশে ভারতীয় খেলোয়াড়দের নায়করূপে পরিভ্রমণ করেছিলেন। (তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের কথা স্মরণ করে তাঁর একটি মর্মর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)। মানুষ হিসাবে পঙ্কজ গুপ্ত ছিলেন অসাধারণ। অত্যন্ত খোলামোলা, আন্তরিক ও মানবিক গুণ সম্পন্ন। তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক ও সম্পাদক ছিলেন এবং আমি যুগান্তরের সম্পাদক রূপে সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য যে, তিনি ছিলেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ক্রীড়াজগতের একজন নায়ক হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিমান। আমরা কখনও কখনও সন্ধ্যাবেলা বার-এ ড্রিংকের আড্ডায় মিলতাম। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল পঙ্কজ গুপ্ত তাঁর আচরণে বয়সের পার্থক্য ভুলিয়ে দিতেন। ডঃ ধীরেন সেন ও আমি একদিন কথায় কথায় তাঁকে বোম্বে যাবার প্রস্তাব ও ট্রেনে আসন না পাওয়ার কথা বললাম। পঙ্কজ গুপ্ত বললেন ট্রেনে আসন কে আটকায়? একথা বলেই তিনি তাঁর স্পোর্টস জগতের ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্মটি গায়ে চড়ালেন এবং বললেন—আমি একটু ঘুরে আসছি, আপনারা অপেক্ষা করুন।

তখন পুরো ইংরেজ আমল এবং যুদ্ধের সময়। কিন্তু পঙ্কজ গুপ্তের সম্মান ও খ্যাতি কলিকাতার ইংরেজমহলেও প্রচুর। সুতরাং তিনি সোজা হাওড়ার স্টেশন মাস্টার এবং রেলের ট্রাফিক সুপারিনটেন্ডেন্টের দপ্তরে গিয়ে হাজির হলেন এবং বললেন, 'আমাকে অমুক তারিখে বোম্বে যেতেই হবে, যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করতে হবে।' আশ্চর্য দেখলুম পঙ্কজ গুপ্তের খাতির। বোম্বাইগামী সেই গাড়িতে একটি স্পেশাল কামরা জুড়ে দেওয়া হলো—যাত্রী ডঃ ধীরেন সেন, পঙ্কজ গুপ্ত এবং আমি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খেলাধুলোয় অসাধারণ সংগঠন শক্তির জন্য বৃটিশ সরকার পঙ্কজ গুপ্তকে এম বি ই উপাধির দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন।

সেদিন রাত্রিবেলা সেই গাড়িতে বসে আমাদের তিনজনের মধ্যে কিছু উত্তেজিত আলোচনা হয়েছিল কিঞ্চিৎ ড্রিংকের প্রসাদে—কিন্তু আলোচ্য বিষয় কিছু মনে নেই। যখন আমরা বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে পৌঁছলুম, তখন পঙ্কজ গুপ্ত সোজা চলে গেলেন বোম্বাইয়ের ভারত বিখ্যাত তাজমহল হোটেলে—অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তখন ওটা ছিল শ্রেষ্ঠ আস্তানা। কিন্তু ডঃ সেন ও আমি উঠবো কোথায়, থাকবো কোথায়, কিছুই ঠিক ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা দুজনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম অত্যন্ত সাধারণ ও সস্তা এক পাঞ্জাবী হোটেলে। যেটা বাঙালী ভদ্রলোকের পক্ষে ছিল নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। খোসাসুদ্ধ ডাল ও মোটা ভাত খেয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়েছিল। আর শোয়ার জন্য সাধারণ একটি খাটিয়া।

নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ডঃ সেন ও আমি গিয়ে হাজির।

কিন্তু আমাদের পরিধানে খদ্দর নেই দেখে আমাদের ঢুকতে দিতে কিছুটা আপত্তির গুঞ্জন শোনা গেল। কিন্তু যখন দেখা গেল আমরা প্রেস রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ বা সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তখন আর বাধা রইলো না।

রাজনৈতিক উত্তাপের জন্য এই অধিবেশন খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেই উত্তোজনা চরম ডিগ্রিতে উঠলো, যখন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী মহাযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের দুর্দিনে ভারতের পক্ষ থেকে 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' বা ভারত ছাড়ো প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

আমার চোখের উপর যেন এখনও গান্ধীজীর সেই প্রশান্ত মূর্তি অথচ উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে—বিরাট মণ্ডপের নিচে পরিপূর্ণ, কিন্তু স্তব্ধ সভাগৃহে সেই কণ্ঠস্বর যেন অদ্ভুত তরঙ্গ সৃষ্টি করলো। গান্ধীজীর ঐতিহাসিক উক্তি স্মরণীয়—'সমগ্র জাতির বুকে যে জ্বালা, সেই জ্বালার দহনে আমার হৃদয়ে যে বিদ্রোহাগ্নি সৃষ্টি করেছে, ভারতের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, সেই আগুন পরিব্যাপ্ত হোক, প্রত্যেক নরনারী, যুবকযুবতী ছাত্রছাত্রী, কৃষক-মজুরের বুকে দাবাগ্নি সৃষ্টি করুক। সেই আগুনে ইংরাজ রাজত্বের সব মলিনতা গ্লানি পুড়ে আসুক নির্মাল্য, আসুক শান্তি। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন—'দাসত্বের চেয়ে অরাজকতা ভালো, আমার আহ্বান প্রকাশ্য বিদ্রোহের। আমি চাই ইংরাজ রাজত্বের অবসান।

মহাত্মা গান্ধী মঞ্চের উপর নিজের আসনে বসে মাইকের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন—সমগ্র সভাগৃহে নিদারুণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো, যেন এই মুহূর্তেই বিদ্রোহ ফেটে পড়বে। আমি যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি এবং কানে শুনতে পাচ্ছি মাইকের সামনে মহাত্মা গান্ধীর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে! Do or die!'

জাতির উদ্দেশ্যে এই চরম আদেশনামা উচ্চারণ করে গান্ধীজী মাইকের সামনে থেকে উঠে গেলেন।

বোম্বাইয়ের সেই ঐতিহাসিক কংগ্রেসী অধিবেশনে (এ আই সি সি) গান্ধীজী জাতিকে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ডাক দিয়ে মাইকের সামনে থেকে উঠে গেলেন বটে, কিন্তু ৯ আগস্ট (১৯৪২) সূর্যোদয়ের আগেই গান্ধীজী গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হলেন। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ প্রমুখ জাতীয় নেতৃবৃন্দ। সারা ভারতে গ্রেপ্তার ও সরকারি নির্যাতনের ধুম পড়ে গেল। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের এই সুবিদিত কাহিনী এখানে আমার আলোচ্য বিষয় নয়।

ডঃ ধীরেন সেন ও আমি সেই সভাকক্ষ ত্যাগ করার আগেই এক ভদ্রলোক আমার নাম ধরে ডেকে এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন—নাম তাঁর সুরেশচন্দ্র

মজুমদার। এই নামটির সঙ্গে যেন শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস ও আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার স্বনামধন্য সুরেশ মজুমদারের নামকে গুলিয়ে ফেলা না হয়। সুরেশ মজুমদার নামীয় যে ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি নলিনীরঞ্জন সরকারের হিন্দুস্থান ইনসিউরেন্স কোম্পানির বোম্বাই শাখার ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার। কেবল সেই পদগৌরবের জন্যই নয়, সুরেশবাবুর হাল ফ্যাশনের সুরূপা স্ত্রী, যিনি সেদিনের বোম্বাই শহরে সোসাইটি লেডি হিসাবে সুপরিচিতা ছিলেন, তার জন্যও সুরেশ মজুমদার এবং তাঁর গৃহ ছিল অতিথেয়তার একটা বড় আকর্ষণ। ফ্যাশানদুরস্ত আধুনিকা মিসেস মজুমদার নাকি ঘণ্টায় ঘণ্টায় শাড়ি বদলাতেন। তাঁর বাড়িতে রাত্রিবেলা আমরা সেদিন চা-পান পর্বের পর গেলুম বটে, কিন্তু গান্ধীজী সহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারীর কানাঘুষা তখন থেকেই আনুমানিক ভিত্তির গুজবে প্রচারিত হচ্ছিল। সুতরাং আমাদের সেই একান্ত প্রাইভেট পার্টিটাও জমলো না। এমন সময় মিঃ মজুমদার সেই টেলিগ্রাম হাতে (যে টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি কংগ্রেসী সভায় আমাকে ডেকে পরিচয় করেছিলেন) ঢুকলেন এবং বললেন মিঃ সরকার দিল্লি থেকে টেলিগ্রাম যোগে বিবেকানন্দবাবুকে অবিলম্বে দিল্লি যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি কিছুটা অবাক হলাম। কেননা নলিনীরঞ্জন সরকার তখন বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর শাসন পরিষদের মাননীয় সদস্য—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী—১৯৪৩ সালে বাণিজ্য ও খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন।

নলিনীবাবু যে আমাকে এত খাতির করতেন তার একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। ১৯৩৫ সালে আমি যখন আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলাম, তখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম (সেই কাহিনী পূর্ববর্তী এক স্থানে আলোচনা করেছি), তখন তিনি গোড়াতেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাঁ, তোমরা নাকি খুব স্বদেশ-প্রেমিক, দেশের স্বাধীনতা ও শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি চাও, তবে হিন্দুস্তান বীমা কোম্পানির নলিনীরঞ্জন সরকারের পিছনে এভাবে লেগেছ কেন?'

রবীন্দ্রনাথের আকস্মিক এই প্রশ্নে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। কেননা, আমি নিজে এবং স্বনামপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কেউ নলিনীবাবুর বিরুদ্ধে এই প্রচার অভিযানের আদৌ সমর্থক ছিলাম না, বরং বিরোধী ছিলাম। আমি কোনমতে চোখ কান বুজে প্রশ্নটার পাশ কাটালুম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন কিছটা উত্তেজিত কণ্ঠেই বললেন—

"জানো, নলিনী এক কাপড়ে বাঙ্গাল দেশ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে এসেছিলেন এবং তারপর নিজের যোগ্যতাবলে বীমা কোম্পানীর পরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সারা ভারতে বাঙালী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অবাঙালীদের কিরূপ শত্রুতা, সেটা কি তোমরা জানো না? কিন্তু নলিনী

সেই বিরোধিতার মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর রাজনীতির কুৎসিত চক্রান্তে তাঁর বিরুদ্ধে এক ব্যাভিচারের মামলা দায়ের করা হলো। নলিনী সেই মামলায় লড়ে গেলেন এবং নির্দোষ সাব্যস্ত হয়ে মাথা উঁচু করে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। আর তোমরা এমন লোকের বিরুদ্ধে লেগেছ, অথচ তোমরা নাকি দেশপ্রেমিক !"

নলিনীরঞ্জন সরকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এমন তৎপর্যব্যঞ্জক মন্তব্য ও মতামত আমি কলিকাতায় তৎক্ষণাৎ সত্যেনদাকে তাঁর বাসায় (সত্যেনদা বোধহয় তখন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের—বর্তমানে বিধান সরণি—রূপবাণীর পাশেই তৈরি প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট বাড়িটাতে থাকতেন) গিয়ে জানালুম এবং সত্যেনদাও অবিলম্বে সেটা টেলিফোন করে নলিনীরঞ্জন সরকারকে জানিয়ে দিলেন। নলিনীবাবু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই মতামতের কথা ভাল করে জানবার জন্য সত্যেনদার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলেন। তিনি আমার মুখে বিস্তৃত সব শুনলেন এবং এই ঘটনার পর নলিনীরঞ্জন সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। সত্যেনদা ও আমি প্রতি রবিবার নলিনীরঞ্জন সরকারের সুবিখ্যাত 'রঞ্জনী' গৃহে (এই গৃহের নামকরণও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ) আড্ডা দিতুম এবং নলিনীবাবুর মুখে কত যে মজাদার রাজনৈতিক গল্প ও কাহিনী শুনতাম তার ইয়ত্তা নেই। স্বরাজ্য দল গঠন, সেদিনের বাংলার মন্ত্রিসভার ভাঙাগড়া ও উত্থান-পতনের নেপথ্য কাহিনী এত শুনেছি যে, নলিনীবাবুকে নিয়ে বোধ হয় একটি পৃথক বই রচনা করা যায়।

নলিনীবাবু নিজে ছিলেন মৈমনসিংহের লোক, কথাবার্তায় বাঙাল দেশী ঢং ও টান ছিল এবং ব্যক্তিগত চালচলন সহজ ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রার ধরন ছিল দস্তুরমত বড়লোকী কিম্বা ধনী ব্যক্তির মত। অবশ্য সেদিনের বাংলায় বাঙালীদের মধ্যে তিনি যেমন ছিলেন একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতা, তেমনি ধনী ব্যক্তিও বটে। তাঁর রঞ্জনী গৃহ ছিল লোয়ার সার্কুলার রোডে—যেমন সুরম্য, তেমনি গৃহনির্মাণ কৌশলের ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্বপূর্ণ। ইতালিয়ান মার্বেল পাথরের ঘুরানো সিঁড়ি ছিল দোতলায় ওঠবার পথে দু'দিকে—একতলায় ছিল ভারতীয় কায়দায় বৈঠকখানা ও দর্শন-প্রার্থীদের বসবার ঘর, আর ছিল চমৎকার ডাইনিং রুম, যেখানে লাটসাহেবকেও আপ্যায়ন করা যেত। পিছনে ছিল প্রকাণ্ড লন—সেখানে আবার দু'জনে মিলে দোল খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। এই রঞ্জনী গৃহে একবার রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

নলিনীবাবুর রঞ্জনী গৃহের নির্মাণ কৌশল সম্পর্কে নানা মজাদারী গল্প প্রচলিত ছিল। যেমন—একদিন সকালে নলিনীবাবুর কোনও একটি প্রয়োজনীয় ফাইলের দরকার হলো। কিন্তু বেয়ারাকে ডাকবার কলিং বেলের সুইচ কোথায়

খ‌ুঁজে পাচ্ছিলেন না, এমন কায়দায় বাড়ি তৈরি। সুতরাং নলিনীবাবু তাঁর বাঙাল কণ্ঠে 'ঘনা' 'ঘনা' বলে উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ঘনা' ওরফে ঘনশ্যাম অত্যন্ত পাকা ও দক্ষ পরিচারক ছিল। সে তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হলে নলিনীবাবু হুকুম দিলেন—"যা, কলিংবেলের সুইচ খুঁজে বের কর, বেল বাজা, তারপর আমার কাছে আয়।"

এই সুরম্য গৃহ কিন্তু নলিনীবাবুর নিজস্ব কোন সম্পত্তি ছিল না। তিনি অকৃতদার ছিলেন, এর আসল মালিক ছিল হিন্দুস্তান বীমা কোম্পানি। নলিনীবাবুর মৃত্যুর পর নয়াচীনের কনস্যুলেট জেনারেলের বাড়ি ও অফিস ছিল এই গৃহ। (অদৃষ্টের পরিহাস—নলিনীবাবু ক্যাপিটালিজমের গোঁড়া ভক্ত, আর তাঁর আবাস হলো মাও সে তুংয়ের কমিউনিস্ট চীনের দূতাবাস।) যখন চীনা দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হলো, তখনও আমার যাতায়াত ছিল এবং চৈনিক ডিনারে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হতাম।

১৯৫৩ সালে নলিনীবাবুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল এবং সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের দিনে দিল্লি থেকে টেলিগ্রামযোগে আমার আমন্ত্রণ এলো রাজধানীতে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণের জন্য।

আগেই অনুমান করা গিয়েছিল যে, মহাযুদ্ধের গতিপথে অবস্থা যখন ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে, তখন যুগান্তর পত্রিকায় আমার লেখা নিয়ে বাংলার বৃটিশ প্রভুদের তেমন মাথা ঘামানোর অবসর থাকবে না। কিন্তু সেই অনুমান ছিল ভুল ধারণাপ্রসূত। দেখা গেল ভবী ভুলবার নয়।

এই সময় ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে দুর্গাপূজার ছুটির আবহাওয়ায় আমি গিয়েছিলাম জামসেদপুরে (শাকচি) আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বাসায়। কিন্তু বি এন আর-এর হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়ি ছাড়ার পর দু'দিকের দৃশ্য দেখে চমকে গেলাম—যেন একটা প্রাকৃতিক ওলটপালটের অস্বাভাবিক দৃশ্য। গাড়ি খুব আস্তে এবং লেট চলছিল। খড়গপুর জংশন স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াবার পর লোকজনের খুব ব্যস্ততা ও ছুটোছুটি লক্ষ্য করলাম। আসলে কোথাও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাচ্ছিল না। বোধহয় আমার সঙ্গে আমার নিজস্ব কিছু খাবার ছিল, তা দিয়ে আমার এবং আমার সহযাত্রী একজনের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটানো গেল। ক্রমে আমরা বুঝতে পারলুম আগের দুদিন যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় মেদিনীপুর জেলা ও সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিকে বিধ্বস্ত করেছে, তারই জের চলেছে রেলপথে। জামসেদপুরে পৌঁছুবার পর আমি কিছু কিছু সংবাদপত্র কয়েকদিন ধরে পড়লুম। কিন্তু এই ভয়াবহ ঝটিকার কোন বিবরণ খবরের কাগজে পেলুম না। আমি কিছুটা অবাক হলাম। এরপর যথারীতি কোলকাতায় ফিরে এসে

ব্যাপারটির অনুসন্ধান করলাম এবং জানতে পারলাম ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলস্ অনুসারে বাংলার সমস্ত ঝড়ের খবর প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তখন জাপানী আক্রমণের ভীতি ছিল। অবশেষে ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলে রিলিফ কার্যের দৌলতে ঝড়ের খবর প্রকাশের অনুমতি পাওয়া গেল। আমি এই ঘটনার উপর যুগান্তর পত্রিকায় 'ঝড়ের বন্ধন মুক্তি' নামে যে সম্পাদকীয় লিখেছিলাম, তাতে নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। অত্যন্ত কাব্যমণ্ডিত ভাষায় ভারতরক্ষা আইনের কবল থেকে ঝড়ের এই মুক্তিলাভকে স্বাগত জানালাম। লেখাটি এমন মর্মস্পর্শী হয়েছিল যে, বিদ্যাসাগর কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা সেই প্রবন্ধটি কাটিং করে তাদের হোস্টেলের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছিল।

এই সম্পাদকীয় পড়েই স্বরাষ্ট্রসচিব পোর্টার সাহেব চটে লাল হলেন এবং তাঁর মনোভাব দাঁড়ালো এই রকম—

'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান।
এইবার ঘুঘু তব বধিব পরাণ'।

অর্থাৎ আমার আগের অনেক লেখা মিঃ পোর্টার আইন অনুসারে অপরাধজনক হিসেবে ধরতে পারেননি। কিন্তু এবার আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা পরিষ্কার। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে তখন জাপানী হানার ভয় এবং ১৯৪২ সালে মিত্রপক্ষের অবস্থাও খুব কাহিল ছিল। সুতরাং ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলের সুযোগ নিয়ে জাপানীরা যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, তবে বাংলার তথা ভারতের সামরিক কর্তারা আত্মরক্ষা করবেন কিভাবে? অতএব 'শত্রুপক্ষের পক্ষে' সহায়ক এমন সম্পাদকীয় রচনার জন্য যুগান্তর'কে সোজাসুজি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো।

তখন অখণ্ড বঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন অনুসারে বাংলার প্রবাদপুরুষ শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন। সে সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও সেই মন্ত্রিসভার অংশীদার—ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী। তখন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রধানকে প্রধানমন্ত্রীই বলা হতো। স্বাধীন ভারতের রাজ্য মন্ত্রিসভার মত মুখ্যমন্ত্রী নয়। যুগান্তরের বিরুদ্ধে এই হুকুমনামার পর আমি ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনকে (তখন তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদক) সঙ্গে নিয়ে ফজলুল হকের বিখ্যাত ঝাউতলার বাসায় দেখা করতে গেলুম। আমাদের দেখেই হক সাহেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অকৃত্রিম কণ্ঠে বলে উঠলেন---'দেখেছ কাণ্ডটা? আমি ঢাকায় ছিলাম। ইতিমধ্যে আমাকে না জানিয়েই সাহেবগুলি (অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারি ও হোম সেক্রেটারি) যুগান্তরের বিরুদ্ধে এই শাস্তির হুকুম জারি করেছে। আমি প্রধানমন্ত্রী না ঘোড়ার ডিম?'

তখন "শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার" (এই কথাটাই তখন চলতি ছিল) খ্যাতনামা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফজলুল হক এবং ডঃ সেন প্রভৃতি একত্রে পরামর্শ করে একটা মীমাংসার ফর্মুলা তৈরি করলেন। আজ আর সেই ফর্মুলার ফর্ম

মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, যুদ্ধের সময় গভর্নমেন্ট বিব্রত বোধ করতে পারে, এমন ধরনের কোন লেখা সম্পাদকের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়াই উচিত। এই মীমাংসা অনুসারে কয়েকদিন পর যুগান্তরেরও বন্ধনমুক্তি ঘটল।

সেই প্রবন্ধটি যুগান্তরে আমার সম্পাদকীয় জীবনে যেন একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচনা করেছিল। কারণ, যুগান্তরের পক্ষ থেকে 'ঝড়ের বন্ধন মুক্তি' প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে সংবাদপত্র সংক্রান্ত কোন কোন প্রদর্শনীতে exhibit করা হয়েছে এবং বহুদিন পর্যন্ত লেখাটি লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। আজও যুগান্তরের কোন কোন পুরাতন বন্ধু ও সাংবাদিক সেই প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন রণাঙ্গনের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে আমি যে সমস্ত forecast বা পূর্বাভাস দিতুম, তা' নিয়ে স্বভাবতই শিক্ষিত মহলেও প্রচুর কৌতূহল ছিল। দু'টি মাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করবো। সত্যেনদা (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) তখন ছিলেন তাঁর কালীঘাটের বাসায়। আমি একদিন বিকেলের দিকে সেই বাসায় গিয়ে হাজির। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস ও আনন্দবাজারের সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং সেই সময় সাধারণত যুদ্ধ ছাড়া আর কোন বিষয়ের আলোচনা তেমন হতো না। কারণ, পরাধীন ভারতের ভাগ্য এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিল। আমিও প্রসঙ্গক্রমে সুরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করলুম—'সুরেশবাবু, আপনাদের সিঙ্গাপুরের সেই নৌদুর্গ তো যায় যায়!'

আমার মন্তব্য শুনে সুরেশবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং বললেন—'যাও যাও চ্যাংড়ামো করো না। যা' জানোনা এবং বুঝে না তা' নিয়ে এই সমস্ত আবোল তাবোল বলার অর্থ কি?'

আমিও কতকটা দৃঢ়তার ভঙ্গীতে জবাব দিলুম—'আচ্ছা, অপেক্ষা করুন, দেখুন কি দাঁড়ায়।'

আমিও সেদিন সন্ধ্যার পর ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে (সারা মহাযুদ্ধের কালপর্বে কলিকাতায় এই ব্ল্যাক-আউট ছিল) শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্কের বাসায় ফিরে এলাম। রাত্রি ৯টার পর হঠাৎ আমার শয্যাপার্শে টেলিফোন বেজে উঠলো এবং ও প্রান্ত থেকে টেলিফোনে আমাকে বলা হলো—'যুগান্তর থেকে বলছি, এইমাত্র সংবাদ এসেছে যে, সিঙ্গাপুর surrender বা আত্মসমর্পণ করেছে!" আমি খুব শান্তভাবে জবাব দিলুম—এটা যে ঘটবে, আমি জানতাম।

দ্বিতীয় ঘটনা উত্তর আফ্রিকায় হিটলারী বাহিনীর অন্যতম সেরা সেনাপতি এবং মরুভূমি যুদ্ধের মায়াবী জেনারেল (ফিল্ড-মার্শাল) রোমেলের পরাজয়। আমরা তখন শ্যামবাজারের দেশবন্ধু পার্কে খুব প্রাতঃভ্রমণ করতাম। বেশ বড় বড় সঙ্গতিসম্পন্ন লোক সেখানে বেড়াতেন, যেমন অবসরপ্রাপ্ত ডিভিশনাল

কমিশনার রায়বাহাদুর চারুচন্দ্র মুখার্জী, ব্যারিস্টার মিঃ বোস, আনন্দবাজারের প্রফুল্লকুমার সরকার প্রমুখ মান্যগণ্য লোকেরা। আমি ছিলাম সকলের বয়োকনিষ্ঠ। তবে একখানা বড় বাংলা কাগজের সম্পাদক ছিলুম বলে এই বড়'র দলে (আমি ঠাট্টা করে বলতুম হাউজ অব লর্ডস।) মেশবার ও তাঁদের সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

স্বভাবতই তখন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বড় একটা আলোচনা হতো না। আমি আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ বোসের দিকে তাকিয়ে বলে ফেললাম—'উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল রোমেলতো এবার হারবে।'

আমার দিকে তাকিয়ে মিঃ বোস খুব অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে বললনে, 'এবার বুঝি গভর্নমেণ্ট তোমাদের ঘুষ দিতে শুরু করেছে ? একথা প্রচার করার জন্য গভর্নমেণ্ট তোমাকে কত টাকা দিয়েছে ?'

উত্তর কলকাতায় ব্যারিস্টার মিঃ বোস একজন বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। তিনি আবার সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎ বসুর বন্ধু ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র তখন বৃটিশ শাসকদের চোখে ধুলো দিয়ে কাবুল, রোম, মস্কো হয়ে বার্লিন গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। পরাধীন ভারতে প্রায় সকলেই ছিলেন বৃটিশ সরকারের উপর নিদারুণ ক্ষুব্ধ। সুতরাং ইংরাজের পরাজয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকেই মনে মনে খুব খুশী ছিলেন। দেশবন্ধু পার্কে বেড়াবার সময় ব্যারিস্টার বোস খুব হামবড়াভাব দেখিয়ে এমন ভঙ্গীতে কথা বলতেন, যেন তিনি শরৎ বসুর বন্ধু হিসেবে সুভাষচন্দ্রেরও অভিভাবক। এদিকে জেনারেল রোমেল উত্তর আফ্রিকায় মরুভূমির যুদ্ধে জয়ের পর জয় অর্জন করে আলেজেন্দ্রিয়া বন্দর ও সুয়েজ খালের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। এই সমস্ত বিদ্যুৎগতি বিস্ময়কর জয়ের জন্য হিটলার তাঁকে ফিল্ড মার্শাল পদবীর দ্বারা সম্মানিত করলেন। আরও পৃথিবীতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো—সুয়েজখাল যায় যায় এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ আসন্ন। সাম্রাজ্যপ্রেমিক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মুখ গম্ভীর এবং তিনিও কমন্সসভায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধসংক্রান্ত আলোচনায় রোমেলের এবং যুদ্ধের সংগঠনে জার্মান রণনৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মত একজন ছেলেমানুষের মুখে রোমেলের পরাজয় আসন্ন, এমন আজগুবি কথা শুনে ব্যারিস্টার মিঃ বোসের মত নাৎসী সমর্থক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পিত্তি জ্বলে যাবারই কথা। তিনি আবার অবজ্ঞা করে বলতেন—'তোমাদের খবরের কাগজ আমি পড়ি না, আর তোমাদের গভর্ণমেণ্টের রেডিও'ও আমি শুনি না। আমি শুনি বার্লিন রেডিও। ফলে সেখানেই খাঁটি খবর পাওয়া যায়।'

মিঃ বোস এমন অবজ্ঞাভরে আমাকে কথাগুলি বলেছিলেন যে, আমি অত্যন্ত আহত ও সম্পাদক হিসেবে বেশ অপমানিত বোধ করলুম। সুতরাং আমিও

বেশ তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলুম—'বেশ, রোমেলের ভাগ্য সম্পর্কে আমি বাজি রাখছি। আমি অবশ্য আপনার মত বড়লোক নই, সুতরাং দশ টাকা বাজি রাখছি। যদি আমি হারি আমি আপনাকে দশ টাকা দেব, আর আপনি…

কথাটা শেষ না হতেই মিঃ বোস মন্তব্য করলেন—'চ্যাংড়ামি করো না, তোমার সঙ্গে আবার বাজি কি হে? তুমি যুদ্ধের কি জানো…?'

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরের তীর ও সুয়েজ-খাল থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী এল আলমিনের যুদ্ধক্ষেত্রে রোমেল বনাম বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল মণ্টগোমারীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হ'ল ও রোমেল কেবল পরাজিত হলেন না, প্রায় সমস্ত রণসম্ভার ফেলে রেখে হাজার মাইল দূরবর্তী লিবিয়ার বেঙ্গাজী বন্দরের দিকে পালিয়ে গেলেন। তবে তাঁর কৃতিত্ব এই ছিল যে, এত দূরে এসে পশ্চাদপসারণ করা সত্ত্বেও মণ্টগোমারির বৃটিশ বাহিনী তাঁকে ধরতে পারলো না। মরুভূমি যুদ্ধের মায়াবী সেনাপতি রোমেলের পরাজয় ছিল অবিশ্বাস্য ঘটনার মত। সারা দুনিয়াতেই বিস্ময়ের ঢেউ খেলে গেল।

পরদিনই (৯ আগস্ট, ১৯৪২) দিল্লিগামী ট্রেনে বোম্বাই থেকে চেপে বসলুম। কিন্তু পথের সর্বত্র কেমন একটা অস্থিরতা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যেটুকু স্টেশন ও চলমান গাড়ি থেকে দৃশ্যমান সমস্তই যেন বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজনা-পূর্ণ। ট্রেনের গতি খুব মন্থর ও যেন কিছুটা সতর্কতাপূর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক ছিল। যত দূর মনে পড়ে বোম্বাই ত্যাগ করার পর দিন কোনও একটা স্টেশনে কয়েকটা মৃতদেহ দেখেছিলাম। চলন্ত ট্রেন থেকে স্টেশনের নাম ধাম কিছু বুঝতে পারিনি। অবশেষে রাত্রিবেলা যখন দিল্লি স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন স্টেশনের বাইরে না যাওয়ার সতর্কতামূলক নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। অবশ্য ট্রেনের মধ্যেই রাত কাটাবার ব্যবস্থা হলো। পরদিন সকাল বেলা একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল স্টেশন চত্বরে এবং সেই ট্যাক্সি করে নলিনীরঞ্জন সরকারের সরকারি বাসস্থান—১ নং ভগবান দাস রোডের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সেই বাড়িতে প্রবেশ ও প্রস্থানের দুটি গেটেই বেয়োনেটধারী সশস্ত্র প্রহরী দেখে ট্যাক্সিওয়ালা ভয়ে আর এগিয়ে যেতে সাহস পেল না। তখন আমিই ট্যাক্সি থেকে নেমে গেটের কাছে গেলুম এবং ভিতরে ঢুকবো কি না ঢুকবো—এই ভেবে ইতস্ততঃ করছি; তখন দেখা গেল একজন লোক সেই প্রশস্ত গৃহের বারান্দা থেকে বেরিয়ে এবং লন্ পার হয়ে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো—আমি কোত্থেকে এসেছি? আমি যখন বললুম—বোম্বে থেকে তখন লোকটি আমাকে ও ট্যাক্সিকে ইঙ্গিত করলো ভিতরে আসবার জন্য—সশস্ত্র প্রহরী নীরবে সব দেখছিল। অর্থাৎ বুঝা গেল মিঃ সরকার আমার

আগমন সম্ভাবনার কথা বলে রেখেছিলেন। সেই সুবৃহৎ হর্ম্যের পাশে ২। ৩টি ছোট ছোট গেস্ট হাউস ছিল। আমি একটি গেস্ট হাউসে অধিষ্ঠিত হলাম আমার সেদিনের একটি সাধারণ সুটকেস্ ও বেডিং নিয়ে। ট্রেনে আসবার সময় পথে যে অস্বাভাবিক অবস্থা দেখেছিলাম তার কারণ ছিল আগস্ট বিদ্রোহের আরম্ভ এবং সরকারি দণ্ডনীতির প্রচণ্ডতা।

১৯৪২-এর পর ১৯৮৬ পর্যন্ত বিগত ৪৪ বছরে অনেকবার দিল্লিতে গিয়েছি। কিন্তু সেই ১নং ভগবান দাস রোড আমার স্মৃতি পথে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং সেই রাস্তার প্রাধান্য ও গুরুত্ব আজও স্বীকৃত—স্বাধীন ভারতে এত অদলবদলের পরেও। তখন রাস্তার নাম ও অবস্থান অনুসারে ব্যক্তির মর্যাদা ও আভিজাত্য নির্ণীত হতো। তখন দেখেছি ভগবান দাস রোড থেকে দিল্লির কোন বড় দোকানে গেলে ক্যাশ টাকা দিতে হতো না। শুধু রাস্তার নাম ও নম্বর বলে দিলেই ক্রীত দ্রব্যের প্যাকেট গাড়িতে এনে তুলে দিত। মূল্যও যথাসময়ে তারা পেয়ে যেত।

নলিনীবাবুর একজন ব্যক্তিগত সহকারী—ভদ্রলোকের নামটা আমি ভুলে গেছি, তবে, দেখতে তিনি ফর্সা ও সুদর্শন ছিলেন। বলা বাহুল্য তিনিও আমার কাছাকাছি একটি গেস্ট হাউসে থাকতেন এবং তাঁর সঙ্গে স্বভাবতই আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। তখন সাহেবিয়ানার যুগ ছিল এবং সেই ভদ্রলোক আমাকে গর্বের সঙ্গে বললেন—'জানেন, এই শর্মা কখনও ধুতি পরেনি।'

তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন দিল্লির নামজাদা দোকানগুলিতে যাতায়াত করেছি এবং তখন লক্ষ্য করেছি ভগবান দাস রোডের আভিজাত্য।

আমি অবশ্য এই সমস্তের দ্বারা খুব প্রভাবান্বিত কিম্বা বিচলিত হইনি। তার একটা বড় কারণ নলিনীবাবুর বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কখনও বাঙালীয়ানা ত্যাগ করেননি এবং চালচলনে আদৌ 'সাহেব' ছিলেন না।

তিনি প্রতিদিনই দুপুর বেলা লাঞ্চের সময় স্বগৃহে আসতেন এবং আমাদের সঙ্গে একত্রে লাঞ্চ করতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর কলিকাতা কিম্বা দিল্লির বাসগৃহের আসবাবপত্র খুব দামী ছিল। একদিন লাঞ্চের সময় কিভাবে দৈবক্রমে একটা কাচের গ্লাস মেঝেতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, তখন শুনলাম ওই গ্লাসটার দাম রুপোর গ্লাসের চেয়েও বেশি।

দীর্ঘ পরবর্তীকালে আমি যখন জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলাম, তখন নলিনীরঞ্জন সরকার ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাসগৃহের আসবাবপত্রের প্রভাব আমার উপরেও পড়েছিল। অবশ্য আমার টাকা ছিল না। তবে, দৃষ্টিভঙ্গিটা বড় হয়ে গিয়েছিল। কলিকাতার এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তি ও নেতার কথা আমার জীবনস্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

দিল্লিতে এবং পরে কলিকাতায় নলিনীবাবুর গৃহে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ধনী ইন্ডাস্ট্রিয়েল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দেখেছি—টাটা, বিড়লা, জালান প্রভৃতি বিখ্যাত পরিবারের নেতারা (স্বনামধন্য ভারতীয় বৈমানিক জে আর ডি টাটাকে ওখানেই দেখেছি বলে মনে পড়ে) মিঃ সরকারের কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, অথচ খুব ভালো এবং শুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল ইংরেজী বলতে পারতেন না, কিন্তু সাহস ছিল অপরিমিত। তাঁর কথাবার্তা ও উচ্চারণ ছিল একেবারে 'বাঙ্গাল দেশী' এবং তার উপর মৈমনসিংহের টান। কিন্তু এই ঝুঁকি নিয়েই নলিনীরঞ্জন সরকার সেদিন প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ ভাইসরয় বা বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর শাসন পরিষদের মাননীয় সদস্যের দায়িত্ব পালন করতেন। ১৯৪১ সালে তিনি ছিলেন বড়লাটের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি দপ্তরের মন্ত্রী এবং সেই সময় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলারও ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় শিল্প মিশনের সদস্য রূপে তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা পরিদর্শন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি, রেলওয়ে ছাঁটাই কমিটি, কোম্পানি আইন সংশোধন কমিটি, বঙ্গ বিভাগের সময় পার্টিশান কমিটির সদস্য এবং ভারতীয় সংবিধান রচনাকালে শাসনতন্ত্রের ধারাগুলি রচনার জন্য নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভাপতি ছিলেন। একসময় বাংলার রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরক্ত যে পাঁচজনকে 'বিগ ফাইভ' (তুলসী গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, বরদা পাইন, বিধানচন্দ্র রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার) বলা হতো নলিনীবাবু তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন—অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শত্রুতাও ছিল প্রচন্ড এবং তাঁর চরিত্র হননের চেষ্টাও ছিল প্রচন্ড।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই সমস্ত সত্ত্বেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন এবং এই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আগেই বর্ণনা করেছি।

নলিনীবাবু বিশিষ্ট কংগ্রেসী নেতা ছিলেন এবং ১৯৪৩ সালে মহাত্মা গান্ধীর অনশনে সরকারি নীতির প্রতিবাদে বড়লাটের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী (ডাঃ বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী) এবং ১৯৪৯ সালে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী রূপেও কাজ করেছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (এসেম্বলীতে) তাঁর একবারের বক্তৃতার কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি জনৈক কংগ্রেসী সদস্যের তীব্র সমালোচনা করলে তাঁকে যখন বলা হলো তিনি নিজে কংগ্রেসী হয়ে কংগ্রেসের লোকদের এভাবে সমালোচনা করছেন কেন তখন কি নলিনীবাবু জবাব দিয়েছিলেন—

'আমি মা কালীর ভক্ত বটে, তাই বলে হালদারদের পূজারী নই!'

অর্থাৎ এই সমস্ত পাণ্ডাদের তোষামোদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় !'

পঞ্চাশের দশকে যখন যুগান্তর সম্পাদকরূপে আমার খুব নাম ধাম প্রচার হয়েছিল এবং নলিনীবাবুর বিখ্যাত রঞ্জনী গৃহে যখন প্রতি রবিবার আমার যাতায়াত ছিল, তখন আমার লেখা সম্পাদকীয় সম্পর্কে তিনি প্রায়ই বলতেন —'বিবেকানন্দের লেখা যেন কথা কয় !'

আবার তিনি এসেম্বলীর বক্তাদের উল্লেখ করে বলতেন—'দ্যাখো, তুমি যুগান্তরে যা লেখ সেগুলিই ওরা বিরোধী পক্ষ থেকে এখানে এসে উদগার কইরা দ্যায় !"

১৯২২ সালে মতিলাল নেহরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কর্তৃক স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠার পর বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁরা প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নলিনীরঞ্জন সরকার ছাড়াও তুলসীচরণ গোস্বামী, কিরণশংকর রায়, বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। কোনও না কোন সময় এঁদের সকলেরই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আমি এসেছিলাম।

নলিনীবাবুর রঞ্জনী গৃহে আড্ডা দেওয়ার সময় অনেক মজার রাজনৈতিক গল্প শুনতে পেতাম। তখন এসেম্বলীতে ডায়ার্কি'র বা দ্বৈত শাসনের পরাজয় ঘটানো পার্টি'র একটা বড় কর্মনীতি ছিল। এজন্য মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার উদ্দেশ্যে ভোট জোগাড় করাই ছিল বড় কথা। ঘুষ দিয়ে হোক বা অন্য কোন কৌশলেই হোক (গান্ধীজী যেগুলির খুব বিরোধী ছিলেন) মন্ত্রিসভাকে কুপোকাৎ করতে হবে। একবার কুমিল্লার একজন মুসলিম সদস্যকে হাত করার জন্য একজন পার্টি সদস্যকে পাঠানো হলো। সেই ভদ্রলোক সেই সদস্যকে ঘুষ দেওয়ার ইঙ্গিত করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে মুখের উপরেই প্রত্যাখ্যান করেন। তখন নলিনীবাবু গেলেন তাঁকে বুঝবার জন্য এবং তিনি সেই মুসলিম সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় নানা সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—'খাঁ সাহেব, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াবার সময় আপনার খুব অসুবিধা হয় না? সেই মুসলিম সদস্য বললেন—নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়। তখন নলিনীবাবু প্রস্তাব করলেন যে, তাঁকে একটা হাতি কিনে দিলে মফস্বল অঞ্চলে তাঁর চলাফেরার পক্ষে নিশ্চয়ই খুব সুবিধা হতে পারে। মুসলিম সদস্যটি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললেন—'হাতি দিলে তো আমি নিতেই পারি, আপনিই বলুন তো নলিনীবাবু কোন ভদ্রলোক ঘুষ নিতে পারে?' নলিনীবাবুও বললেন—'আরে রামো রামো, ঘুষের কথা মুখেও আনা উচিত নয়।'

এভাবেই সেই মুসলিম সদস্যের ভোট ও অন্যান্যের ভোট সেদিনের ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে দেওয়া হলো এবং মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো।

মতিলাল নেহরুকে টেলিগ্রামযোগে এই সংবাদ দেওয়া হলে তিনি মন্তব্য করেন,

Yes, diarchy is dead, but it died a very costly death !

অর্থাৎ অনেক টাকা খরচ করে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটানো হয়েছে।

এমন কি কোন কোন সদস্যকে মদ ও অন্যান্য উপচার দিয়ে আটকে রেখে ভোটদানে (সরকার পক্ষে) বিরত রাখা হয়েছিল।····

কিরণশঙ্কর রায়, তুলসীচরণ গোস্বামী প্রভৃতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দলের পরিমন্ডলে।

কিরণশঙ্কর ও তুলসী গোঁসাই উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান ও অভিজাত ঘরের সন্তান। ঢাকার তেওতার জমিদার বংশে কিরণশঙ্কর এবং শ্রীরামপুরের বিখ্যাত রাজা কিশোরীলালের পুত্র ছিলেন তুলসী গোঁসাই। কিশোরীলাল ছিলেন সেই দিনের বাংলার লাটের শাসন পরিষদের প্রথম ভারতীয় সদস্য। তুলসীচরণ গোস্বামী ইংল্যাণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে ও গ্রীক, ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিরণশঙ্কর রায়ও ইংল্যাণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেন এবং পরে আবার বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। অতএব এঁরা সেদিন বাংলায় নিজেদের বিদ্যাবত্তার গুণেই খুব প্রভাবশালী ছিলেন। এর উপর ছিল বংশমর্যাদা, অবশ্য নলিনী-রঞ্জন সরকারের পক্ষে এই ধরনের আভিজাত্য দাবির কোন সুযোগ ছিল না। তবু নিজের অনন্যসাধারণ প্রতিভার জন্য তিনি ছিলেন এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য, যদিও অত্যন্ত বিতর্কিত ব্যক্তি—রাজনৈতিক দলাদলির জন্য তিনি ছিলেন কোন কোন গোষ্ঠীর কাছে সমাজের অপাংক্তেয় বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।

কিরণশঙ্কর রায় অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী, ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী এবং শক্তিশালী সাহিত্যিক ও বাকপটু ছিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তাঁর ইউরোপীয়ান এসাইলামের গৃহে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন ও আমি বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। কথায় কথায় অস্বাভাবিক ঘটনার বা অলৌকিক কাহিনীর কথা উঠে। ডঃ সেনও যথেষ্ট বিদ্বান ও সাম্যবাদী দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি নিজে অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বললেন—'একদিন বাড়ি ফেরার পথে ফুটপাত দিয়ে চলমান একজন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখে ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করলেন যে কেমন আছে ইত্যাদি। এরপর বাড়িতে ফিরে তিনি দেখলেন তাঁর টেবিলের উপর সেদিনের ডাকে আসা একখানা চিঠি পড়ে আছে। সেই চিঠিটি পড়ে তিনি একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। কেননা পথে তিনি যে ব্যক্তির সঙ্গে ভদ্রতার আলাপ করেছিলেন চিঠিতে তারই মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়েছে এবং তার মৃত্যু ঘটেছে দুদিন আগে!

সুতরাং প্রশ্ন উঠলো এর ব্যাখ্যা কি? বলা বাহুল্য যে, সন্তোষজনক কোন উত্তর মিললো না।

এরপর কিরণশঙ্কর রায় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন বরিশালে এবং বছরে এক-আধবার শ্বশুরবাড়ি যেতেন। কিন্তু যাওয়ার আগে প্রতিবারই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতেন কবে কখন তিনি জলপথে শ্বশুরবাড়ির ঘাটে পেঁাছুবেন। কারণ, নদীর ঘাট থেকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে শ্বশুরবাড়ি যেতে হতো। একবার কিরণবাবু ঘটনাচক্রে হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করলেন, পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেওয়ার তেমন সুযোগ ছিল না। যখন তিনি শ্বশুরবাড়িতে পেঁাছুলেন, তখন কর্তাব্যক্তিরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তুমি এলে কি করে? আগে তো কিছু জানাওনি।'

কিরণবাবু জবাব দিলেন—'কেন, ইয়াসিনতো যথারীতি হ্যারিকেন নিয়ে নদীর ঘাটে ছিল!'

জবাব শুনে কর্তাব্যক্তিরা নিঃশব্দে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

পরদিন জানা গেল, ইয়াসিন নামে যে ব্যক্তি নদীর ঘাটে হ্যারিকেন নিয়ে বরাবর কিরণবাবুকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে, সে মাসখানেক আগে কলেরায় মারা গেছে।

সেদিন কিরণবাবাবুর আড্ডায় এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার কোন যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা মিললো না।....

তুলসী গোঁসাই যে একজন পাকা অভিজাত, খুব হুইস্কি পান করতেন (সেদিনের কলিকাতার সাহেবী হোটেলগুলিতে একমাত্র তুলসী গোঁসাইকেই ধুতি চাদর পরে লাঞ্চ বা ডিনার টেবিলে বসার অধিকার দেওয়া হয়েছিল) এবং লর্ড সিনহার মেয়ে লেডি রমলা সিনহার সঙ্গে প্রেমে মশগুল ছিলেন, এই সব তথ্য বা কেলেঙ্কারির কথা আমাদের যৌবনকালের কলকাতার সর্বজনবিদিত ছিল।

কিন্তু আভিজাত্য কি, সেটা আমাদের মত গরিব ঘরের ছেলেদের তেমন জানবার কথা নয়। কিন্তু আমার জানার সুযোগ হয়েছিল।

নলিনীরঞ্জন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি প্রায় সকলেই রাজনৈতিকভাবে সুভাষচন্দ্রের বিরোধী ছিলেন এবং এঁরা ছিলেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের বা গান্ধীনীতির পক্ষে। আমি তখন যুগান্তরের সম্পাদক এবং অমৃতবাজার ও যুগান্তর ছিল সুভাষ বিরোধী। যুগান্তরে আমরা সুভাষচন্দ্রকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও সুনাম হানিকর লেখা ছেপে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতাম। আমরা তখন ঠাট্টা করে তাঁকে বলতাম—'সংগ্রাম সিংহ' এবং মাঝে মাঝেই এই মর্মে সংবাদ দিতাম যে, সংগ্রাম সিংহের শিবির থেকে নোটিস বেরিয়েছে একটি জরুরী সমাবেশের ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত রচনাটা বিদ্রূপব্যঞ্জক ছিল।

ফলে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সমর্থকরা খুব চটে গিয়ে যুগান্তর বয়কটের ডাক দিলেন ও নানা স্থানে বয়কট সভা করতে লাগলেন। সেদিনের বাংলায় (অবশ্য আজও) সুভাষচন্দ্র ছিলেন অপরাজেয় নেতা। ফলে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পর্যন্ত বিপন্ন হয়েছিল।

সুতরাং আমরাও বাধ্য হয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জেহাদ ঘোষণা করলাম।

১৯৩০-১৯৪০'এর দশকে স্বাধীনতা ও স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ প্রবল ছিল। সেই সময় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও মোহিনী মিলস ছিল স্বদেশী মনোভাবের প্রতীক স্বরূপ। বিলাতী কাপড় বর্জন করে স্বদেশী বস্ত্র ও খদ্দর ব্যবহার ছিল দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এই স্বদেশী বস্ত্র উৎপাদনের অন্যতম প্রাণ-কেন্দ্র কুষ্ঠিয়ার মোহিনী মিলসের এবং মিলের প্রতিষ্ঠাতা চক্রবর্তী পরিবারের খুব নামডাক ছিল। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন এবং অতিথিবৎসল। একবার মোহিনী মিলসের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সেদিনের বাংলার খ্যাতনামা অর্থ-নীতি বিশেষজ্ঞ নলিনীরঞ্জন সরকার প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা রূপে আমন্ত্রিত হলেন। অবশ্য একা নলিনীবাবু নন, কলিকাতার সমস্ত বাঙালী ও বিশিষ্ট সাংবাদিকরাও আমন্ত্রিত হলেন। এই আমন্ত্রণ আমার সাংবাদিক জীবনেও বেশ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে।

তখনকারদিনে চিটাগাং মেল বেশ নামকরা গাড়ি ছিল, গোয়ালন্দ, পূর্ববঙ্গ যাত্রার জন্য। কিন্তু গাড়ি ছাড়তো বোধহয় ৭টার সময়। আমরা সাংবাদিকরা প্রায় সকলেই হন্তদন্ত হয়ে যথাসময়ে শিয়ালদহ স্টেশান পেঁছিলাম। সেখানে মোহিনী মিলসের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। আমাদের কামরার সকলকেই ব্রেকফাস্ট দেওয়া হলো। আমরা ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলুম। গাড়িও প্রায় ছেড়ে দেওয়ার সময় হলো। কিন্তু প্রতাপদা'র (ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়) দেখা নেই। আমরা একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলুম। গাড়ির প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেল, কী মুশ্কিল, প্রতাপদা তখনও এলেন না। আমরা যখন প্রতি মুহূর্তে প্রতাপদার গাড়ি ফেল করার চিন্তায় উদ্বিগ্ন, তখন দেখি প্রতাপদা হাঁপাতে হাঁপাতে এবং কিছুটা অস্থির ভাবে এসে উপস্থিত। আমরা সকলে কলকণ্ঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললুম—'আসুন, প্রতাপদা, আপনার এত দেরী?' প্রতাপদা তৎক্ষণাৎ সস্মিত মুখে জবাব দিলেন, কি করবো ভাই, আমার তো আর তোমাদের মত ব্রেকফাস্ট-টাস্ট সাহেবিয়ানা পোষায় না। কাজেই দুটি পান্তাভাত মাছভাজা দিয়ে খেয়ে এলুম। জান তো বাঙ্গালদের কাছে এ জিনিসের কত আদর।—

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায় সেদিনের বাংলার একজন নামজাদা রাজনৈতিক কর্মী

ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিকও ছিলেন। মাতৃভূমি নামক দৈনিক পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক এবং এই মাতৃভূমিকে তিনি কংগ্রেস কর্মীদের মুখপত্র বলে অভিহিত করতেন—মাতৃভূমির নামের তলাতেই এই কথাটা লেখা থাকতো এবং কুষ্ঠিয়াতে আমন্ত্রণ তাঁর সাংবাদিক হিসেবেই। বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ নেতা বলে আমরা অনেকেই তাঁকে প্রতাপদা বলে ডাকতুম। আমার সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। কারণ পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার যে অঞ্চলে আমার বাড়ি ছিল, প্রতাপদাও সেই অঞ্চলের লোক ছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম। বৃত্তির দিক থেকে তিনি তখন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গকে সেদিন অনেকেই যেমন উপেক্ষা করে সুখেস্বাচ্ছন্দে ঘর করতে পারেননি, তেমনি প্রতাপদাও তা পারেননি। আমাদের ওই অঞ্চলে চরমাইনর নামে একটা চর ছিল এবং সেখানে সাধারণ গরিব মানুষদের কী একটা আন্দোলন উপলক্ষে বৃটিশ আমলের পুলিশ মারমূর্তি হয়ে উঠেছিল। প্রতাপদা সেই নির্যাতিত গরিব মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই থেকে একজন বক্তা, কিম্বা 'মেঠো বক্তা রূপে' অর্থাৎ জনগণের ভাষায় ক্ষেপিয়ে তোলার আর্টে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং একজন নেতার পদবীতে উন্নীত হলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরও সাকরেদগিরি করেছিলেন। দেশের জন্য তাঁর দুঃখবরণ, ত্যাগ স্বীকার ও দারিদ্র্যবরণ বৃথা যায়নি। স্বাধীনতার পর তিনি সেদিনের ব্যবস্থা পরিষদ বা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে মনোনীত হয়েছিলেন।

মানুষ হিসেবে প্রতাপদার তুলনা নেই। অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত অমায়িক, অতিথি পরায়ণ ও ভোজনরসিক ছিলেন। এক কালে আমাদের দেশের গ্রাম্য লোকেরা যে ধরনের ভোজনপটু ছিলেন এবং নিজেরা খেতে ও অপরকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন, প্রতাপদাও অনেকটা সেই ধরনের মানুষ ছিলেন। কিন্তু জীবনের দীর্ঘকাল দেশ সেবায় কাটাবার ফলে দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। আর সেদিনের সাংবাদিকতাও এক ধরনের দারিদ্র্যব্রত ছিল (অবশ্য সাহিত্যিকদের অবস্থাও অনুরূপ ছিল)। কিন্তু গরীবানা সত্ত্বেও প্রতাপদা বন্ধুবান্ধব ও স্নেহভাজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে ভুলতেন না। কারণ, তিনি নিজেই খেতে ভালবাসতেন। আমি কখনও কখনও তাঁর কলিকাতার বাসায় যাতায়াত করেছি এবং দেখেছি তক্তপোষের তলায় অনেক লাউ, কুমড়ো ও তরকারি। এগুলি তিনি দোকান থেকে 'বাকী' আনতেন—অর্থাৎ সব জিনিসের দাম একসঙ্গে দিতে পারতেন না। কিন্তু সেদিন অনেক দোকানিই প্রতাপদাকে সম্মান করতেন। সুতরাং প্রতাপদার বাজার করার কোন অসুবিধা হতো না। মনে পড়ে একদিন আমরা কি একটা উপলক্ষে অনেকে প্রতাপদার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছি। অনেক কিছু

খেলাম বটে, কিন্তু শেষের দিকে দই পেলাম না, তখন হঠাৎ একজন বলে ফেললেন—একি প্রতাপদা, দই দিলেন না ?

প্রতাপদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—'কি করবো ভাই, সবই বাকিতে পেলুম, কিন্তু দইটা আর বাকিতে পেলুম না।'

এমন সরল, এবং এমন ভোজনরসিক ছিলেন প্রতাপদা। অথচ তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। খাওয়াদাওয়ার এবং আতিশয্য সত্ত্বেও তাঁর শরীর কিন্তু ভাঙেনি। তিনি বোধহয় দীর্ঘ ৯২ বছরের উপর বেঁচে ছিলেন।

সম্ভবত ১৯৪২ সালের আন্দোলনের কিম্বা তার কাছাকাছি সময় প্রতাপদা ছিলেন দেওঘরে। আমি ও আমার বন্ধু যোগেশ দে (অনেক কাল আগেই পরলোকগত) ঘুরতে ঘুরতে দেওঘরে গিয়ে হাজির। যোগেশ দে খুব রসালো গল্প করতে (অবশ্যই সেক্স ঘটিত—আমরা তখন টাটকা যুবক) এবং খেতে ভালবাসতো। প্রতাপদাতো আমাদের দেখে খুব খুশি। বলা বাহুল্য যে, বাজার করার ধুম পড়ে গেল। কিন্তু এত খেতে আমি গররাজি ছিলুম দেখে প্রতাপদা বলতেন—আরো খেয়ে ফেলো, কিছু হবে না, এমন এক ডোজ ওষুধ দেব যে, সব হজম হয়ে যাবে !'

দেওঘরের উদার মাঠঘাট দেখে সে বয়সে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। যোগেশ দে'র পরিচিত একজন বন্ধু—সুধাময় দাসের সঙ্গে কিভাবে সেখানে আমার পরিচয় হয়েছিল সেকথা আজ ভুলে গেছি। আমরা তাকে সুধাদা বলে ডাকতাম—মোটাসোটা চেহারা, বেশ ভালো লোক। কিন্তু খুব ড্রিঙ্কে অভ্যস্ত ছিল। সেখানেই প্রথম সুধাদার পাল্লায় পড়ে মহুয়ার মদ খেয়েছিলাম, শুনেছি ভালুকেরা নাকি মহুয়া গাছে উঠে মদ খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়তো। অতএব আমারও যে নেশা হবে, সেটা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু বিপদে পড়লুম কিভাবে এই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রতাপদার বাড়িতে ফিরে যাবো ? অবশ্য বন্ধুবর যোগেশ দে সাহায্য করলো এবং সে-ই প্রতাপদাকে ম্যানেজ করে আমাকে নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে এলো। প্রতাপদা অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান এবং হৃদয়বান লোক, সুতরাং তিনি বুঝেও না বোঝার ভান করলেন।

প্রতাপদা সহ, আমরা সাংবাদিকরা কুষ্ঠিয়ায় পেঁছিলাম। মোহিনী মিলসের বার্ষিক উৎসব সভায় নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁর লিখিত সুদীর্ঘ অর্থ-নৈতিক বক্তৃতা পাঠ করলেন। সত্যি বলতে কি, একে অর্থনৈতিক বিষয় তার উপর লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ আমাদের অনেকের কাছেই dull মনে হয়েছিল। রাত্রিবেলা চক্রবর্তী পরিবারের আতিথেয়তায় এবং প্রকান্ড থালা ও বহুপ্রকার বাটিতে পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্য দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। অবশ্য অনেকেই সেই সমস্ত খাদ্যের সদ্ব্যবহার করলেন।

ট্রেনে ফেরার পথে প্রতাপদা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। নলিনীবাবুর জন্য

ছিল আলাদা বিশেষ ব্যবস্থা। সুতরাং আমরা সাংবাদিকরা একটি পৃথক কামরায় উঠলাম – সত্যেনদা (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) ছিলেন আমাদের লীডার। গল্প বলতে আড্ডা জমাতে ও বাকপটুতায় সত্যেনদার জুড়ি কেউ ছিল না। আমাদের সঙ্গে হুইস্কির বোতলও দেওয়া হয়েছিল। কারণ, সত্যেনদা ড্রিঙ্কে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য, সাহস ও দৈহিক গঠন ছিল চমৎকার। বাল্যে ও কৈশোরে কোচবিহারের রাজবাড়ির অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর প্রভূত। তাঁর মুখে রাজবাড়ির আভিজাত্যের কাহিনী এবং বিকৃতি ও ব্যাভিচারের যে সমস্ত গল্প শুনেছি, সেগুলি প্রায় অবিশ্বাস্য এবং ছাপার হরফে প্রকাশ করা যায় না।

সত্যেনদা তাঁর ড্রিঙ্কের অভ্যাসের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, কোচবিহারের রাজবাড়িতে থাকার সময় (তাঁর অভিভাবকেরা সেখানে তখন চাকুরি করতেন) এই অভ্যাসের সূত্রপাত। তিনি বললেন যে, তিনি যখন খুব নিচু ক্লাসের ছাত্র, তখন একদিন স্কুলে গিয়েছেন এবং ক্লাসে বসেছেন, এমন সময় তাঁর পাশে বসা এক ছাত্র হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে ক্লাসের শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বললেন—'স্যার, সতুর (সত্যেনদা) মুখ থেকে বিশ্রী মদো মদো গন্ধ বেরুচ্ছে।'

শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত অবাক হয়ে সতু বা সত্যেনকে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার রে ?

সত্যেনদা দ্বিধাহীন চিত্তে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,—হ্যাঁ স্যার, আমি বীয়র খেয়েছি।'

শিক্ষক হতভম্ব হয়ে বললেন—'বীয়র ? মদ ?'

সত্যেনদা অনায়াসে জবাব দিলেন—হ্যাঁ স্যার। আমাদের বাড়িতে কেউ জল খায় না। সকলেই বীয়র খায়।

ক্লাসের মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতখানি বিহ্বলতার সৃষ্টি হতো না।

তখন ঊনবিংশ শতকের শেষের দিক এবং কোচবিহারের মত নেটিভ্ স্টেট্। কাজেই সমগ্র পারিপার্শ্বিক অবস্থাই ছিল সামন্তযুগীয়। এই আবহাওয়ার মধ্যে সত্যেনদার বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল।

মোহিনী মোহন চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠিয়ার মোহিনী মিলসের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য ট্রেনে চাপলুম। যতদূর মনে আছে প্রত্যাবর্তন পথে প্রতাপদা (প্রতাপচন্দ্র গুহরায়) আমাদের সঙ্গে ছিলেন না। বোধহয় 'চ্যাংড়াদের' সংসর্গ এড়িয়ে যাওয়াই তিনি বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করেছিলেন। সুতরাং সত্যেনদাকে ক্যাপ্টেন করে আমরা 'চ্যাংড়া' সাংবাদিকের দল ট্রেনের কামরায় অধিষ্ঠিত হলাম। তখন আমরা নবীন যুবক এবং 'অকারণ পুলকে' আমাদের মন উল্লসিত। শীঘ্রই

কামরায় আমাদের আড্ডা জমে উঠল। সত্যেনদার মত এমন রসিক জমাটি লোক সেদিনের সম্পাদক বা সাংবাদিকদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল প্রভূত—তথাকথিত উচ্চশিক্ষা কিম্বা কলেজের শিক্ষাও তাঁর ছিল না। (এ দিক দিয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল)। ট্রেনের কামরায় যখন রাত্রি ঘনিয়ে এলো তখন দেখা গেল হুইস্কির বোতল খোলা হয়েছে। কুষ্ঠিয়া থেকেই কে এই বোতল আমাদের সঙ্গে দিয়েছিল জানি না। সত্যেনদা ড্রিঙ্কের খুব ভক্ত ছিলেন। ব্যাচেলার মানুষ। গায়ে পায় বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী—চেহারা পুরুষোচিত। সুতরাং অনেক রকমের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ছিল। রাজবাড়ি (কোচবিহার) ও কাটা কাপড়ের দোকানে চাকুরি করা লোক জীবনের নানা কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। বঙ্কিমী যুগের গদ্য রচনার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে সেদিন যাঁরা বলিষ্ঠ প্রবন্ধ লেখাকে উর্ধে তুলে ধরেছিলেন (সংস্কৃতবহুল সাধুভাষা) সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তখনকার দিনের আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর সম্পাদকীয় রচনা ছিল সেই পত্রিকার অন্যতম সেরা আকর্ষণ। জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে সত্যেনদার সম্পাদকীয় যেন অগ্নিবর্ষণ করতো। হাজার হাজার পাঠক সেই উদ্দীপনাময় সম্পাদকীয় পড়ে উদ্বুদ্ধ হতেন। আজকের দিনে যেমন সম্পাদক ও সম্পাদকীয় একেবারে পিছনে পড়ে গেছে, এমন কি চাপা পড়েছে এবং বদলে এসেছে মার্কিনী ঢংয়ের feature ও রিপোর্ট ও রং-চংয়ে ছাপার বাহুল্যে, এই শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ দশকে তা ছিল না। সম্পাদকের নামেই কাগজের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। আজ পাঠকেরা জানেন না আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক কে, যদিও সর্বভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আজ তার কোটি কোটি টাকা আয়। অবশ্য স্বাধীনতার পর দেশে যে দ্রুত সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ইণ্ডাস্ট্রি, টেকনোলজি ও সায়েন্সের জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, তখন তার কিছুই ছিল না। কিন্তু তখন পত্রিকার সম্পাদক ও সম্পাদকীয়-এর যে মর্যাদা ও প্রভাব ছিল (এবং বড় দেশনেতারাও পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন) আজ তার কিছুই নেই।

ব্যক্তি জীবনে সত্যেনদা ক্রমশ গান্ধীবাদকে অতিক্রম করে বামপন্থী মতবাদের দিকে এবং সুভাষচন্দ্রের রাজনীতির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মিটিং করতে একবার বাংলার বাইরেও গিয়েছিলেন। তারপর জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি মার্ক্সবাদের ও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভক্ত হয়ে উঠলেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে সত্যেনদাই প্রথম মার্ক্সবাদের সমর্থক ও প্রচারক হয়েছিলেন। বাঙালী সম্পাদকদের মধ্যে স্ট্যালিনের জীবিতকালে তিনিই যে সর্বপ্রথম সোভিয়েত রাশিয়া পরিদর্শনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন একথা আগে এক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

সত্যেনদা বক্তা হিসেবেও খুব শক্তিশালী ছিলেন এবং সময় সময় আবৃত্তিও চমৎকার করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত অরণি সাপ্তাহিক পত্রিকা তো সেদিনের তরুণ কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্রের মত ছিল। ফলে যুবক সমাজে সত্যেনদার জনপ্রিয়তা ও সম্মান ছিল প্রভূত। কুষ্ঠিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন পথে সত্যেনদাকে কেন্দ্র করে আড্ডা বেশ জমে উঠলো। অনেকেই দু-এক ঢোক হুইস্কিও পান করলেন। এমন সময় সত্যেনদাকে অনুরোধ করা হল রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা আবৃত্তি করার জন্য। অবশ্য আমাদের কারুর সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের কোন বই ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য সত্যেনদা দাঁড়িয়ে উঠে রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তি সংবাদ আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন। কোথাও কোন শব্দ বা বাক্যের ভুল হল না। ছন্দপতন ঘটলো না। এত বড় সুদীর্ঘ কবিতা যে এমন অনায়াসে এবং কারুর কোন প্রকার সাহায্য ছাড়া আবৃত্তি করা যেতে পারে সেটা যেন আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর উচ্চারণ, তাঁর পুরুষোচিত ভঙ্গী সমস্ত কিছু মিশে ট্রেনের কামরায় এক অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হলো। সমস্ত কামরাটা যেন তাঁর কণ্ঠস্বরে গম্‌গম্‌ করতে লাগলো। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই আবৃত্তি শুনতে লাগলাম।

সেই সুদীর্ঘ কবিতার আরম্ভটা ছিল এরকম ঃ

কর্ণ। পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যা সবিতার
বন্দনায় আছি রত। কর্ণ নাম যার,
অধিরথসূতপুত্র, রাধাগর্ভজাত
সেই আমি—কহো মোরে তুমি কে গো মাতঃ!
কুন্তী। বৎস, তোর জীবনের প্রথম প্রভাতে
পরিচয় করায়েছি তোরে বিশ্ব-সাথে,
সেই আমি আসিয়াছি ছাড়ি সর্ব লাজ
তোরে দিতে আপনার পরিচয় আজ।
কর্ণ। দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর সূর্যকরঘাতে
শৈল তুষারের মতো। তব কণ্ঠস্বর
যেন পূর্বজন্ম হতে পশি কর্ণ-পর
জাগাইছে অপূর্ব বেদনা।
কহো মোরে,
জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্য-ডোরে
তোমা-সাথে হে অপরিচিতা........ইত্যাদি ইত্যাদি।

আজ কত কাল হয়ে গেছে তবু সেই রাত্রি, সেই আবৃত্তি ভুলতে পারিনি।....
আমরা যখন রানাঘাট জংশন স্টেশনে পৌঁছলাম, তখন রাত ৯টা বেজেছে।

কিন্তু এদিকে বিভ্রাট, হুইস্কির বোতল শূন্য—সত্যেনদার এবং আরোও অনেকেরই কণ্ঠ তৃষ্ণার্ত। আমাদের কামরার যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ নেমে স্টেশন মাস্টারকে গিয়ে ধরলেন এবং বললেন কলিকাতার বড় বড় পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিকরা এই গাড়িতে যাচ্ছেন। তাঁদের জন্য হুইস্কি চাই। ভদ্রলোক প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু তারপর সংবাদপত্র ও সম্পাদকের কথা শুনে নিজেই স্টেশনে খোঁজ নিলেন—কেলনারের (Kelner) দোকানে। কিন্তু রাত ৯টার পর তো আর কেলনার খোলা রাখা সম্ভব ছিল না—বিশেষত মফস্বল স্টেশনের দোকান। সেদিনের বৃটিশ শাসনের যুগে কেলনার (ইংরেজ কোম্পানি) আর পার্শীদের সোরাবজী ছিল রেলওয়েতে মদ সরবরাহের সবচেয়ে বড় এজেন্ট।

সাংবাদিক জীবন প্রধানত রাষ্ট্র ও সমাজের ঘটনাবলী এবং উত্থান-পতনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ঝড়বৃষ্টি, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি যেমন তেমন দেশ ও সমাজের সর্বস্তরের ঘটনা বা দুর্ঘটনা ও পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে তাকে তাঁর বৃত্তির খাতিরেই খবর নিতে ও পর্যালোচনা করতে হয়। আমার সাংবাদিক জীবনে যুদ্ধের ভূমিকা ছিল প্রকাণ্ড—সেই প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত। সুতরাং সাংবাদিক জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করে দেখতে পাই সময় সময় অতি ভয়ঙ্কর সব ঘটনার সঙ্গে আমার বা আমাদের মত সাংবাদিকদের পরিচয় ঘটেছিল।

১৯৪২ সালের যুদ্ধকালীন ভারতের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' আগস্ট বিদ্রোহ ও সরকারী নির্যাতনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু বৃটেনের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী ভারতের বিচ্ছেদের পর সমগ্র পরিস্থিতির ক্রমশই অবনতি ঘটছিল। ১৯৪৩ সালে এই অবস্থা যেন চরম পর্যায়ের দিকে গেল। যুদ্ধের মওকায় ভারতের একশ্রেণীর লোক গভর্নমেণ্ট ও সমর বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা বিত্তবান হয়ে উঠতে লাগলো, অপর দিকে জনসাধারণের স্কন্ধে যুদ্ধের বোঝা অসহনীয় হয়ে উঠলো। আমাদের দেশের মানুষ সাধারণত গরিব এবং অন্নাভাবক্লিষ্ট। আর সেই সঙ্গে দেখা দিল অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি। ভারত একটা যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত হলো। তার দুই পার্শ্ব দেশে—পশ্চিমে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্বদিকে মালয় ও ব্রহ্মদেশ—নাৎসী জার্মানি ও সমরবাদী জাপানের আক্রমণের নিদারুণ আশঙ্কার মধ্যে পড়ল। আমার মনে আছে জার্মানি ও জাপানের এই ভারত বা বৃটিশ সাম্রাজ্য বেণ্টন নীতির গ্রাণ্ড স্ট্র্যাটিজি নিয়ে দেশ বিদেশের কাগজে ও রণনীতিকদের মধ্যে তখন নানা গবেষণা মুখর হয়ে উঠেছিল। ভারতের দুই পার্শ্বদেশের এই বিপদের সম্ভাবনা

সেদিনের বৃটিশ সরকারকে প্রায় স্নায়বিক দুর্বলতাগ্রস্ত করে তুললো। কারণ, প্রাচ্য খণ্ডে জাপানের বিদ্যুৎগতি আক্রমণ ও জয়ের ফলে বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশগুলি হাত ছাড়া হয়ে গেল, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর জাপানী নৌ-অভিযানের আওতার মধ্যে এসে গেল। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও জাপানী অধিকারে চলে গেল এবং যে কোন মুহূর্তে সিংহল দ্বীপ (যার ত্রিঙ্কোমালি নৌঘাঁটি আজও সুবিখ্যাত) ও ভারতের দক্ষিণ উপকূলভাগ এবং পূর্বাঞ্চল জাপানী নৌ সৈন্য ও স্থলসৈন্যের আক্রমণ ও অনুপ্রবেশের মুখে পড়ার আশঙ্কা বেড়ে গেল। কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জাপানী বোমারু হানার আশঙ্কা জনগণকে সন্ত্রস্ত করে তুললো। আর সেই সঙ্গে ব্রহ্মদেশ থেকে পলায়িত অজস্র ভারতীয় নাগরিকের আশ্রয়প্রার্থীরূপে আগমন এবং তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কাহিনী সারা ভারতে তুমুল উত্তেজনা ও আতঙ্কের সঞ্চার করলো। ভারতের বৃটিশ আমলাতন্ত্র যেমন হৃদয়হীন ছিল, তেমনি ভীরু ও অপদার্থ ছিল। তারা জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় মাদ্রাজ পোতাশ্রয়ের একটা অংশ পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেললো এবং সরকারি অফিসারেরা জীবনহানির ভয়ে পালিয়ে গেল! এদিকে পূর্ববঙ্গে পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করা হলো এবং সেই নীতি অনুসারে হাজার হাজার নৌকা ধ্বংস করে ফেলা হলো। অথচ নদীনালা খাল বিলের দেশে নৌকাই ছিল যোগাযোগ ও জীবিকার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। আমি নিজে পূর্ববঙ্গে জন্মেছিলাম এবং যৌবনকাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। সুতরাং সেখানকার নৌকার উপযোগিতা আমাদের মত 'বাঙ্গালরা' সকলেই সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই নৌকা গেল ধ্বংস হয়ে। এদিকে দক্ষিণ এশিয়াতে ভারত যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ও সরবরাহ ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ায় এবং লক্ষ লক্ষ দেশীয় সৈন্যের সঙ্গে বিদেশী (আফ্রিকান, আমেরিকান ও চীনা) সৈন্যের ভীড় বাড়তে থাকায় স্বভাবতই খাদ্যশস্যের সরবরাহ প্রশ্নে জটিলতা দেখা দিল। কিন্তু বিদেশ থেকে খাদ্যশস্যের আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। আর স্বদেশের শস্যভাণ্ডার গেল মিলিটারি, সরকারি এজেন্ট ও দালালদের হাতের মুঠিতে। ক্রমে দেখা গেল কালোবাজারি, মুনাফা-বাজি ও মজুতদারি। দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ক্রমে নিকটতর হতে লাগলো। কিন্তু জরুরী ভারতরক্ষা আইন অনুসারে সেই সমস্ত সংবাদ ছাপানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৯৪২ সালের শরৎকালে (বা দুর্গাপূজার সময়) মেদিনীপুরে ভয়াবহ সাইক্লোন ও বন্যার ফলে প্রচুর শস্যহানি ঘটলো। সেই সময় আমার জামশেদপুর যাওয়ার পথে এই সাইক্লোনের প্রতিক্রিয়া দেখেছিলাম ; কিন্তু সাইক্লোনের খবর তখন ছাপা হলো না দেখে বিস্মিত হলাম। যখন ১৮ দিন পর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলো, তখন যুগান্তর পত্রিকায় আমি 'ঝড়ের বন্ধন মুক্তি' নামে যে সম্পাদকীয় লিখেছিলান, তার জন্য ভারতরক্ষা আইনে তিন দিনের জন্য

যুগান্তরের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে, সেই চাঞ্চল্যকর সম্পাদকীয় এখনও যুগান্তরের পক্ষে সংশ্লিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে কারুর কারুর স্মরণে আছে।

এই সমস্ত উপদ্রব ও অনাচার একত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত ডেকে আনলো সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। যা ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত। মহাযুদ্ধের বলি হল ভারতের জনগণ। বাংলা, মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িষা ও আসাম পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়লো। ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার অন্তত এক তৃতীয়াংশ কিম্বা ১২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের দ্বারা আক্রান্ত হলো। প্রধানত গ্রাম্য অঞ্চলের গরিব চাষী, ভূমিহীন মজুর ও কারিগর শ্রেণীর লোকেরাই সবচেয়ে বেশি মারা পড়লো। বাংলার গ্রামে গ্রামে, খালে বিলে, শহরে শহরে ও কলিকাতায় রাস্তার হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। এই মহানগরীর গৃহস্থ বাড়ির দরজায় অনাহারক্লিষ্ট নরনারী ও শিশুর করুণ আর্তনাদ—'মাগো একটু ফ্যান দাও!' —মনে হয় এখনও যেন কানে বাজছে। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ কেবল যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঘটেনি। স্বয়ং জওহরলাল নেহরু এই দুর্ভিক্ষকে 'মনুষ্য সৃষ্ট' বলে নিন্দা করেছিলেন। কারণ, সরকারি আমলাতন্ত্রের হৃদয়হীনতা, আর মিলিটারি কন্ট্রাক্টরদের বজ্জাতি এবং ব্যবসায়ীয়ের মুনাফাবাজী ইত্যাদি মিলে এই দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিল। ১৭৬৬ থেকে ১৭৭০ সালের মহাদুর্ভিক্ষের (বাংলায় ও বিহারে প্রথম বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকালে) সঙ্গেই এই মন্বন্তরের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। মৃতের সংখ্যা ৩৫ লক্ষ থেকে ৭৫ লক্ষের মধ্যে।

তবে এই বিপর্যয়ের মধ্যে সেদিনের বাংলার সেবাব্রতধারী মানুষদের মনুষ্যত্বের পরিচয়ও কম পাইনি। কমিউনিস্ট পার্টি সেদিন দেশে যুদ্ধে সহযোগিতার মনোভাবের জন্য (সোভিয়েত রাশিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে) অত্যন্ত ধিকৃত ছিল। বিশেষত ১৯৪২'এর কুইট্ ইন্ডিয়া আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য। কিন্তু সমস্ত নিন্দা, গ্লানি এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে শারীরিক লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তাঁরা দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবায় যথাসাধ্য এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের এই মানবপ্রেম নিশ্চয়ই স্মরণীয় ছিল। অবশ্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও লঙ্গরখানা খুলেছিলেন।

মণীষী গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ' (১৯৮৬) বই থেকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের স্মৃতিচারণার কয়েক লাইন উদ্ধৃতি দিয়েই এই বেদনাক্লিষ্ট ঘটনাটি শেষ করছি।

বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর ১৩৫১ সালের কথা স্মরণ করে বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তিনি সরকারি মনোভাব সম্পর্কে লিখেছিলেন—

"একান্নতে মন্বন্তর আসেনি। অবস্থার উন্নতি হয়েছে তা স্পষ্ট।

কলিকাতার পথে পথে মানুষ মরে পড়ে নেই। পায়ে পায়ে জীবন্ত নরনারীর কঙ্কাল ফুটপাতে, পার্কে ঠেকে না। লঙ্গরখানা বন্ধ হয়েছে···ফ্যান ফ্যান করে কেউ দুয়ারে হানা দেয় না। ডাস্টবিনে কুকুরে-মানুষে মারামারি নেই। ···খবরের কাগজে তাদের ছবি দেখেও কাউকে বারে বারে শিউরে উঠতে হয় না। তার এক কোণে লেখা থাকে সামান্য ক'জন দুঃস্থ হাসপাতালে কবে মরেছে।"

জীবনের পান্ডুলিপির দ্বিতীয় পর্বের অনেকখানিই ছিল সাম্প্রদায়িক বর্বরতার হত্যাকান্ডের দ্বারা কলঙ্কিত এবং দেশের অনেকগুলি রাজ্য শোণিত-স্রাবী ঘটনাবলীর দ্বারা সমাচ্ছন্ন। সাংবাদিক ও নাগরিক হিসেবে এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলুম—যেমন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষও জড়িয়ে পড়েছিলেন রক্ত ও অশ্রুর প্লাবনে।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর বৃটেন অবসন্ন, হতবল ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। যে বৃটিশ সিংহের গর্জন প্রায় অর্ধ পৃথিবী জুড়ে তার বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে শোনা যেত এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে যে সূর্য এই সাম্রাজ্যে কখনও অস্ত যেত না, ১৯৪৫ সালের পর দেখা গেল সেই সূর্য অস্তগামী এবং সেই রাজকীয় শাসক জাতির দেশবাসীরা এক কাপ চায়ের জন্য চিনি পর্যন্ত যোগাড় করতে পারছে না! সুতরাং এই অবস্থায় 'Rule Britania, Britania Rules the Waves. Britons Never shall Be Slaves !'—এই স্পর্দ্ধিত সঙ্গীত সমুদ্রে সমুদ্রে নাবিক ও নৌসৈন্যেরা আর কিভাবে সমবেত কণ্ঠে গাইবে? অতলান্তিক থেকে ভারত মহাসাগর এবং সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসমুদ্র পর্যন্ত প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে বৃটিশ নৌবলের এই প্রাধান্য আর রইলো না। অন্ধ সাম্রাজ্যপ্রেমিক উইনোস্টোন চার্চিলের সেই উদ্বেলিত কণ্ঠস্বরও আর শোনা গেল না। বৃটেন ভারত সাম্রাজ্য থেকে 'তাম্বু গুটাবার' সিদ্ধান্ত নিল।········

ভারতের স্বাধীনতা যে আসন্ন এই গবেষণা রাজনৈতিক মহলে মহাযুদ্ধ অবসানের আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। সুতরাং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এবং দেশবাসী চঞ্চল ও উদগ্রীব হয়ে উঠলো। মুসলিম লীগের পান্ডাদের মাথায় দ্বিজাতি তত্ব ও প্যাকিস্তান সৃষ্টির দাবী অনেকদিন আগে থেকেই প্রবেশ করেছিল। তাঁদের মতে জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ভারতের মেজরিটি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং মুসলিম সমাজের যে অংশ কংগ্রেসের ও ভারতীয় স্বাধীনতার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক, তারা হচ্ছে 'হিন্দুদের দালাল'! মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত মণীষী ও দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনতার যোদ্ধাও মুসলিম লীগের কাছে অপাংক্তেয়। সুতরাং দ্বিজাতি তত্বের ভিত্তিতে তাঁদের কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো মুসলমানেরা হিন্দু শাসিত ভারতের প্রজা হিসেবে বাস করবে না, তাদের জন্যে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র চাই, যার নাম পাকিস্তান।

'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' এই রণধ্বনি ক্রমেই উচ্চস্বরে ধ্বনিত হতে লাগলো তাঁদের কণ্ঠে যতই ভারত সাম্রাজ্য থেকে বৃটিশ রাজশক্তির অপসৃত হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো।

চারদিকে এমন নিদারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি ও আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো যে, স্বাধীনতাকামী ভারতে যেন একটা বিস্ফোরণের মুখে এসে পড়লো।

এই উত্তেজনাপূর্ণ উত্তপ্ত দিনগুলিতে আমি ছিলুম যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক পদে। তখন রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে আমার বাস। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে রাতে বাড়ির বাইরে যথেষ্ট নিরাপদ বলে বিবেচিত হতো না। সুতরাং নিকটতম প্রতিবেশী সঞ্জীব ভট্টাচার্যের বাড়ির একতলায় আমি এবং ডাঃ নরেশ তালুকদার (যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের) প্রভৃতি আড্ডা দিতুম। সঞ্জীব ভট্টাচার্য অত্যন্ত উদার প্রসন্ন-চিত্ত ও মহৎ চরিত্রের মানুষ ছিলেন—তিনি প্রয়াত হয়েছেন অনেক বছর আগেই এবং বয়সেও আমার চেয়ে বড় ছিলেন। তিনি জার্মানিতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় কৃতী হয়েদেশে ফিরে এসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ স্মরণে রেখে একটি 'স্বদেশী' কারখানার প্রতিষ্ঠা করলেন বরাহনগরে। তিনি ছিলেন অকৃতদার এবং কারখানার কর্মতৎপরতা প্রসারণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এই কারখানার প্রতিষ্ঠা দিবসের স্মরণ উৎসবে আমি একাধিকবার প্রধান অতিথির ভাষণ দিয়েছি।

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের এক সন্ধ্যায় আমি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে সঞ্জীববাবুদের একতলায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম এমন সময় তদানীন্তন বাংলার প্রধানমন্ত্রী (আসলে মুখ্যমন্ত্রী) সাহিদ সুরাবর্দীর কণ্ঠস্বর বা বক্তৃতা শোনা গেল রেডিওতে। কিন্তু বক্তৃতাটি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ও রক্তপাতের হুমকিতে ভর্তি ছিল। আসলে তখন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে Direct Action-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল। ফলে, রক্তপাত ও হাঙ্গামার সূত্রপাত হলো। আমি সঙ্গে সঙ্গেই যুগান্তরে 'হত্যাকারীর কণ্ঠস্বর' নামে এক সম্পাদকীয় লিখলাম—যে সম্পাদকীয়টি সেদিনের বাংলাদেশে অভূতপূর্ব আলোড়ন ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, এই রচনাটির জন্য লেখককে সোনার দোয়াত কলম দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো উচিত।

মুসলিম লীগ ও সুরাবর্দীর ডাইরেক্ট অ্যাকশন শ্লোগানের ফলে শুরু হয়ে গেল ১৬ আগস্টের সেই (১৯৪৬) ইতিহাসখ্যাত বা কুখ্যাত ভয়াবহ দাঙ্গা—'The Great Calcutta Killing'—গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক এই হেডিংটি কলিকাতার বিখ্যাত ইংরাজী পত্রিকা (তখন সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদের পরিচালিত ও সম্পাদিত) স্টেটসম্যান-এর দেওয়া এবং এই শিরোনামটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইলো।

সেদিনেই সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা যদিও আজ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে (৪৪ বছর আগেকার) ম্লান হয়ে গেছে, তবু ১৯৪৬ সালের রক্তাক্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি।

সারা শহরব্যাপী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ছোরা মারামারি শুরু হয়ে গেল, আর শাসক ইংরেজ বেশ মজা দেখতে লাগলো। 'সাম্রাজ্যের কারবার গুটিয়ে নেবার আগে তারা স্বাধীনতাকামী ভারতকে 'শেষ শিক্ষা' দিয়ে যেতে চাইলো। শুধু তা-ই নয়, 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির যারা পরিচালক তারা মনে মনে গূঢ় কূটনৈতিক মতলব পোষণ করছিল।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ঘৃণা ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ধরনের সিভিল ওয়ারের (গৃহযুদ্ধ) ছুতো ধরে, তারা ভারতবর্ষকে পার্টিশান করার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলো। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর পর্যন্তও ভারত ও পাকিস্তান যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপরেই নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য যে তাদের এই মতলব অনেক দিন পর্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল। এই রক্তপাত ও পার্টিশানের ব্যাপারে মুসলিম লীগ ছিল ইংরাজের দোসর।.... .

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগস্ট মাসের সেই দিনগুলিতে আমি ছিলুম রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে—উল্টাডিঙ্গি অঞ্চলে। খালের ওপারে ছিল উল্টাডিঙ্গির মুসলমানদের ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি এলাকা। সেখান থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার হতেই আল্লা হো আকবর ধ্বনিত হত। আর এপার থেকে তার জবাবে ধ্বনিত হত বন্দে মাতরম্। দিনের বেলাও লোক যাতায়াত খুব সামান্য ছিল এবং দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রয়োজনে যদি কোন হিন্দু মুসলমান এলাকায় কিম্বা যদি কোন মুসলমান হিন্দু এলাকায় গিয়ে পড়তো, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। অথচ দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগে হিন্দু ও মুসলমান হাটে বাজারে ফুটপাতে পাশাপাশি দোকান চালিয়েছে, বিকিকিনি করেছে। কিন্তু আজ তারা পরস্পরের শত্রু হয়ে গেল—খুনের নেশায় যেন মত্ত হয়ে গেল। যে মুসলিম ফলওয়ালার বা মাংসওয়ালার কাছ থেকে হিন্দুরা দিনের পর দিন ফল বা মাংস কিনেছে কিম্বা যে মুসলমান হিন্দু দোকানদারদের কাছ থেকে গামছা বা লুঙ্গি কিনেছে অথবা বাজারে শাক-সব্জি বা মাছ কিনেছে, আজ তারাই পরস্পরের গলা কাটতে লাগলো। ভয়াবহ, বর্বর ও অমানুষিক দৃশ্য। সন্ধ্যার পরে তো বটেই, দিনের বেলায় প্রকাশ্য সূর্যালোকে মানুষ মানুষকে অনায়াসে খুন করলো। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গরিবেরা মারা পড়লো—আর গরিবের তো হিন্দু মুসলিম ভেদ নেই। কত যে রিক্সাওয়ালা মারা পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

কতপ্রকার ভয়াবহ গুজব যে তখন ছড়িয়ে পড়তো, ফলে আরও উত্তেজনা বেড়ে যেত, তারও কোন শেষ ছিল না। যেমন—'মেয়েদের ধরে বলাৎকার

করে, তাদের স্তন কেটে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে'—এগুলি আবার প্রমাণ শূন্য 'স্বচক্ষে দেখা গুজব।' পাড়ায় পাড়ায় আত্মরক্ষার জন্য সেই সমস্ত যুবকদের সংঘবদ্ধ করা হলো, যারা একদা ভদ্র গৃহস্থের কাছে অবাঞ্ছিত ও গুন্ডা প্রকৃতির বলে বিবেচিত ছিল। পরবর্তীকালে মস্তান শব্দটির বহুল প্রচলন এবং প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মস্তান পোষণের সূত্রপাত কিন্তু ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় রক্তাক্ত দিনগুলি থেকে। কারণ, আত্মরক্ষার এইটি ছিল সহজতর উপায়। আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে নামকাওয়াস্তে পুলিস ছিল. কিন্তু তারাও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মিলিটারিও দেখা দিয়েছিল এবং মাঝে মাঝে টহল দিত। কিন্তু দাঙ্গা ও হত্যাকান্ড রুদ্ধ হয়নি।

বলা বাহুল্য যে, হাটবাজার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। গৃহস্থের পক্ষে তো এই দুর্বিপাকের জন্য পূর্বাহ্নে কোন প্রস্তুতি ছিল না। সুতরাং দুবেলা খাদ্য জোটানো—একমাত্র চাউল ছাড়া, একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। আমার মনে আছে তখন কোনও ক্রমে একটি কুমড়ো জোগাড় হলে সেটিই পরম দুর্লভ বস্তুরূপে রান্না খাওয়া হত। একদিন শ্যামবাজারে (তখন আমরা উত্তর কলিকাতায়ই থাকতাম) কিভাবে একটা মাছের চালান এসেছিল। কিন্তু সেই মাছ কেনার পর গুজব রটে গেল যে, মুসলমানেরা কৌশলে ওর মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে, খেলেই মৃত্যু।

দাঙ্গা থেমে যাওয়ার অনেক দিন পর কোন কোন খালে বা ব্রীজের নিচে কিম্বা পরিত্যক্ত রিক্সার মধ্যে মৃতদেহ দেখা যেতো।

এমন বীভৎস বর্বরতার দিন গিয়েছে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে, যার শুরুতে ছিল সেই সম্পাদকীয় 'হত্যাকারীর কণ্ঠস্বর !'—

১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ে ৬৭ হাজার লোক নিহত হওয়ার পর এবং সেই বীভৎস দিনগুলিতে আমার মত অজস্র লোকের মানসিক যন্ত্রণার পর এলো ১৯৪৭ সাল—ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বছর। লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনকে কেন্দ্র করে যে চাঞ্চল্যকর ও বিভ্রান্তিকর নাটকের শুরু। তাঁর আগে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ওয়েভেল, যিনি পূর্বাঞ্চলীয় রণাঙ্গনের একজন নামজাদা সেনাপতি ছিলেন বটে, কিন্তু একটি যুদ্ধজয়েরও কৃতিত্ব অর্জন করতে পারলেন না। তখন তাঁকে রণক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে (অবশ্য যুদ্ধ তার অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং জাপান এ্যাটম বোমা বর্ষণের বর্বরতায় আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিল) ভারতের বড়লাট পদে নিয়োগ করা হলো। বৃটেনের তখন শ্রমিক দলের ক্লেমেন্ট এ্যাটলির গবর্ণমেন্ট এবং তাঁরা ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগে কৃতসংকল্প ছিলেন। কিন্তু ভারতে তখন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ শিখ ও দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতির মধ্যে ক্ষমতা-

লাটের যে দ্বন্দ্ব ছিল, স্যার আর্চিবল্ড ওয়েভেল সেই সমস্ত দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে একটা মীমাংসার পথ বের করার পক্ষে উপযুক্ত লোক ছিলেন না। তিনি মিলিটারির লোক, সুতরাং প্রতিরক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করে তিনি ভারত খণ্ডনেরও (তখন থেকেই পার্টিশানের কথা বৃটিশ কর্তাদের মনে ঘুরছিল) পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে বড়লাটের পদ থেকে অপসারিত করে নতুন একজন দক্ষ ব্যক্তিকে আনার ব্যবস্থা হলো। ওয়েভেলের পর নজর পড়লো দক্ষ, বুদ্ধিমান ও চতুর লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রতি। যার জন্য মাউন্টব্যাটেন প্রস্তুত ছিলেন না।

কে এই মাউন্টব্যাটেন? তিনি একেবারে রাজকীয় অভিজাত নীল রক্তের অধিকারী। রাজা ষষ্ঠ জর্জের খুল্লতাত ভ্রাতা এবং ভারত সাম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন অত্যন্ত ধনবতী গৃহের কন্যা। শুনা গেল ইউরোপের বড় বড় সম্রাট পরিবারের সঙ্গেও মাউন্টব্যাটেনের কোনও না কোন সূত্রে সম্পর্ক ছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কূটনীতিতেও তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস রচনা সূত্রে আমার জানা ছিল যে, তিনি বৃটিশ সামরিক পুরুষদের মধ্যে একজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। জাপানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণক্ষেত্রের তিনি ছিলেন সুপ্রিম কম্যান্ডার। কিন্তু সামরিক কূটনীতিতেও তিনি খুব ওস্তাদ ছিলেন। এজন্য তিনি উইনস্টোন চার্চিলের খুব প্রিয় ছিলেন। ১৯৪২ সালের জুন মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাৎসী ফ্যাসিস্ট আক্রমণ যখন অত্যন্ত দুর্দান্ত হয়ে উঠেছিল, তখন সোভিয়েত রণাঙ্গন থেকে চাপ কমাবার উদ্দেশ্যে চারদিক থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবি উঠেছিল। এমন কি খাস ইংল্যান্ডের জনমতও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার দাবি সমর্থন করলো। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ সেই সময় বৃটেনে চার্চিলের সঙ্গে দেখা করে দ্বিতীয় রণাঙ্গন নিয়ে সমালোচনা করলেন এবং চতুর সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল এমনভাবে কথা বললেন যে, মলোটোভের ধারণা হলো চার্চিলও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পক্ষপাতী। এরপর মলোটোভ গেলেন ওয়াশিংটনে এবং সেখানে গিয়ে তিনি বড় বড় মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। রুজভেল্ট সোভিয়েত রাশিয়া ও স্ট্যালিনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁর মনে চার্চিলের মত কোন ঘোরপ্যাঁচ ছিল না। সুতরাং ১৯৪২ সালেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা সম্পর্কে একমত হয়ে একটা মার্কিন-সোভিয়েত ইস্তাহার পর্যন্ত প্রকাশ করা হলো। এই কাণ্ড দেখে চার্চিলের তো চক্ষু স্থির। তিনি রুজভেল্ট ও মার্কিন কর্তাদের বুঝিয়ে দিলেন কেন এই সময় দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খোলা সম্ভব নয়, সেটা ব্যাখ্যা করার জন্য যে অসাধারণ চতুর ও ধূর্ত ব্যক্তিকে দূতরূপে ওয়াশিংটন পাঠালেন

তাঁর নাম লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন। এই মাউন্টব্যাটেনই এলেন ভারতবর্ষে ভারত সম্রাট জর্জের শেষ রাজ-প্রতিনিধি বা ভাইসরয় রূপে।

প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলির পরামর্শে যখন ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত হলো, তখন সেটাকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসের এক শীতার্ত সকালে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে মাউন্টব্যাটেনের ডাক পড়লো। মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং রাজার মুখে ভারতবর্ষ পরিত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা শুনে বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বোধহয় 'কী ভয়ঙ্কর' শব্দটি বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাজা ষষ্ঠ জর্জ তাঁর খুড়তুতো ভাইকে (কাজিন) বেশ শান্তভাবেই ভারত ত্যাগের রাজকীয় সিদ্ধান্তের কথাই জানিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন যে, লর্ড মাউন্টব্যাটেনকেই এই দায়িত্ব বহন করতে হবে। কারণ, ক্যাবিনেট ও তাঁর নিজেরও মত অনুসারে তিনিই এই বিষয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি।

এই রাজকীয় অনুষ্ঠানের পর মাউন্টব্যাটেনের আর অসম্মত হওয়ার উপায় ছিল না। এই নতুন দায়িত্ব নিয়ে তিনি যখন রাজধানী নয়াদিল্লির সেই বিরাট প্রাসাদ-ভবনে পেঁছিলেন, তখন বিদায়ী বড়লাট লর্ড ওয়েভেলই তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা জানালেন।

মাউন্টব্যাটেন অত্যন্ত চতুর, দক্ষ ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি যখন ভারতে এলেন তখন ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগ আহূত ডাইরেক্ট অ্যাকশনের দাঙ্গা এবং ১৯৪৭ সালেও সেই দাঙ্গার জের চলছিল। অন্যদিকে ভারত ছিল স্বাধীনতার প্রত্যাশায় উত্তাল। সেই সময় পূর্বদিকের রণাঙ্গন থেকে যুদ্ধ শেষে দলে দলে সৈন্যরা ফিরে আসছিল এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মাদনায় সারা দেশ ব্যাপী এক প্রকাণ্ড ঢেউ চলছিল। যুদ্ধফেরত এই সৈন্যরা রাত্রিবেলা ট্রাকে বা লরীতে করে যখন যেতেন, তখন তাঁদের কণ্ঠে জয়হিন্দ ধ্বনিতে সমস্ত আকাশ, বাতাস ও রাজপথ মুখরিত হতো। আমি বাগবাজার স্ট্রীটে যুগান্তরের সম্পাদকীয় দপ্তরের কাজ সেরে রাত্রিবেলা যখন পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম, তখন কতদিন যুদ্ধফেরত সেই সমস্ত সৈনিকের কণ্ঠে জয়হিন্দ ধ্বনি শুনে কী অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। আজও এত বছর পরেও রাত্রিবেলা শহরের বুকে ধাবমান ট্রাক থেকে সৈন্যদের সেই ধ্বনি যেন কানে বাজছে। জয়হিন্দ তখন জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। বন্দেমাতরমও যেন কিছুটা পিছনে পড়ে গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের ফৌজরাই জয়হিন্দ ধ্বনি দিতেন। আর ছিল 'দিল্লি চলো' এবং 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' এক ধরনের সামরিক মার্চের সঙ্গীত। আমার একান্ত বিশ্বাস যদি নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবন্ত অবস্থায় দেশে ফিরে আসতে পারতেন,

তবে ভারত খণ্ডিত (পার্টিশান) হতো না। দেশের দুর্ভাগ্য। বাংলার দুর্ভাগ্য যে সুভাষচন্দ্র আর ভারতে ফিরে আসতে পারলেন না। আজও তাঁর সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ (প্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যু না হত্যা?) হওয়ার রহস্য নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হয়নি। ভারত তখন একেবারে প্রকাশ্য বিদ্রোহের মুখে এসে পড়েছিল। সুতরাং বৃটিশ সরকারের—যে সরকার মহাযুদ্ধের জন্য একেবারে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, তাদের পক্ষে ভারত সাম্রাজ্য শাসন করা আর সম্ভব ছিল না। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে লণ্ডনে চলতি কথাই ছিল—'উপুস করে থাকো, আর শীতে হি হি করে কাঁপো!'

এই অবস্থায় ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। অথচ দীর্ঘকাল ধরে উপমহাদেশের মত সুবৃহৎ ভারতে বৃটিশ শাসন অব্যাহত ছিল মাত্র ২ হাজার আই সি এস অফিসার, ৬০ হাজার বৃটিশ সৈন্য আর ২ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যের দ্বারা এবং এই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল ১০ হাজার ইংরেজ অফিসারের উপর। সেই সমস্ত বিচিত্র সাম্রাজ্যবাদী দিনের অবসান আজ আসন্ন হয়ে উঠলো।

১৯৪৭ সালের ২৪ মার্চ লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন নয়াদিল্লিতে ব্রিটিশরাজের শেষ প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের গদিতে অভিষিক্ত হলেন। ব্রিটিশ রাজশক্তির সর্বপ্রকার জাঁকজমক এই উপলক্ষে যেন সহস্র ধারায় উৎসারিত হলো। তিনি ছিলেন এই অসাধারণ মর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন পদের ২০তম অধিকারী—হ্যাস্টিংস থেকে শুরু করে লর্ড কার্জনকে পিছনে ফেলে এবার দিল্লির সিংহাসনে বসলেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। যে রাজপ্রাসাদের দরবার হলে তাঁর অভিষেক হলো, বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ তার বর্ণনায় বলেছেন যে ভার্সাইয়ের বিখ্যাত ফরাসী রাজপ্রাসাদ কিম্বা রাশিয়ার জারদের পিটার্সবুর্গের রাজপ্রাসাদের সংগেই তার ঐশ্বর্য তুলনীয়।

স্বাধীনতার পর এই বড়লাট-প্রাসাদই রাষ্ট্রপতি ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেখানে দু'বার—যখন ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তখন এবং ১৯৭০ সালে যখন আমাকে পদ্মভূষণ খেতাবের দ্বারা সম্মানিত করা হলো, তখন এই ভবনের দরবার কক্ষ দেখেছি বলে মনে পড়ছে। কিন্তু ভার্সাই বা জারদের প্রাসাদের মত তেমন কোন জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য আমার চোখে পড়েছিল বলে মনে পড়ে না। অবশ্য আমার স্মৃতিভ্রংশও হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু সে কথা যাক। পণ্ডিত নেহরু নাকি মাউণ্টব্যাটনকে দেখে তাঁর ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কাছে মন্তব্য করেছিলেন 'ভগবানকে ধন্যবাদ যে একজন কড়া ধাতের লোক নয়। এবং মানবিক গুণসম্পন্ন একজন ভাইসরয়কে পাওয়া গেল।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এভাবে—মাউণ্টব্যাটেন দিল্লিতে পেঁছেই খুব

বুদ্ধিমানের মত স্থির করলেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যে ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যখন কার্যকর করতেই হবে (কারণ সেটাই ছিল এ্যাটলি ক্যাবিনেটের নির্দেশ) তখন আগে থেকেই পটভূমিকাকে সহজ করে তুলতে হবে এবং সেজন্য ভারতীয় নেতাদের হৃদয় সর্বাগ্রে জয় করতে হয়। সই সময় জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে এক গার্ডেন পার্টিতে মাউন্টব্যাটেন দম্পতি গিয়ে হাজির। ব্রিটিশ রাজত্বের ২০০ বছরের মধ্যেও কেউ এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখেনি এবং যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা একে অবিশ্বাস্য মনে করে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন নেহরুর কনুই ধরে সেই উদ্যান-সম্মেলনে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন এবং আন্তরিকভাবে করমর্দন করে বিদায় নিলেন। এই ঘটনার পরেই নেহরু তাঁকে 'মানবিক গুণসম্পন্ন বড়লাট' বলে অভিহিত করেছিলেন (ফ্রিডম্ এ্যাট্ মিড্নাইট্ পুস্তক)। কিন্তু ভারতের অদ্বিতীয় জাতীয় নেতা নেহরুর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের এই প্রকার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার যদি ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে, তবে, অন্য একটি পার্টিতে 'হিতবাদ' পত্রিকার (নাগপুরের) সম্পাদকের সঙেগ মাউন্টব্যাটনের অনুরূপ ব্যবহারকে ইতিহাসের কোন্ পর্যায়ে ফেলবো ? কারণ এই ঘটনাটা আমি নিজে জানি একজন সাংবাদিক হিসেবে এবং হিতবাদ পত্রিকার সেই সম্পাদক সর্বভারতের তেমন কোন বিখ্যাত ব্যক্তিও ছিলেন না।

আসলে মাউন্টব্যাটেন ছিলেন অত্যন্ত চতুর এবং ধূর্ত। কিন্তু ভদ্রতা ও সৌজন্যের ছদ্মবেশে তিনি তাঁর এই চাতুর্যনীতিকে আড়াল করে রাখতেন। কারণ, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দক্ষ প্রতিনিধিরূপেই তিনি তাঁর সমস্ত কাজ পরিচালনা করেছিলেন এবং ভারতের পার্টিশনকে বাস্তবে কার্যকর করেছিলেন—যদিও মুখে তিনি সবসময় পার্টিশনের বিরোধিতা করতেন।

মাউন্টব্যাটেনের এই চাতুর্যনীতির জন্যই চার্চিল তাঁকে এত পছন্দ করতেন (ওয়াশিংটনে তাঁর দৌত্যগিরির কথা আগেই উল্লেখ করেছি) এবং প্রধানমন্ত্রী এ্যাট্লি তাঁকে ডেকে বলে দিলেন একবার চার্চিলের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কারণ, 'ইংলন্ডে আসল ক্ষমতার চাবিকাঠি তাঁর হাতে।'

মাউন্টব্যাটেন চার্চিলের সঙ্গে দেখা করলেন। একথা সুবিদিত যে, চার্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্ধভক্ত এবং ভারতবিরোধী মনোভাব তাঁর প্রবল। তবু মহাযুদ্ধের ধাক্কায় তাঁর গোঁড়ামির দুর্গও ভেঙে পড়ার মুখে। এই সময় মাউন্টব্যাটেন তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখনও কিছুটা রক্ষা করা যেতে পারে—এই ধরণের একটা মন্তব্য করলেন। ঝানু কুটনীতিক চার্চিল জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ভাবে ? তুমি কি লিখিতভাবে কিছু পেয়েছ ?' মাউন্টব্যাটেন জবাব দিলেন—নেহরু এ্যাটলিকে

এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে, যদি অনতিবিলম্বেই ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হয়, তবে, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যেই তিনি সেটা গ্রহণে প্রস্তুত হবেন।

কিন্তু গান্ধীর মনোভাব কি ?

মাউণ্টব্যাটেন স্বীকার করলেন যে, গান্ধীর মনোভাব সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কিছুই বলা সম্ভব নয়। একথা সত্য। তবে নেহরু ও প্যাটেলের সহযোগিতায় তিনি গান্ধীকে বাগে আনতে এবং ভারতকে সংকট পার করে দিতে পারবেন।

চার্চিল তখন তাঁর বিখ্যাত চুরুট মুখে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন এবং মাউণ্টব্যাটেনকে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শুভেচ্ছা জানালেন—ভারতের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হলো (ফ্রিডম এ্যাট্ মিডনাইট্ পুস্তক)।

ভারতে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতা চরমে উঠেছে। পাঞ্জাবের অবস্থা ভয়ংকর— দস্তুর মত সিভিল ওয়ার ! হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা অবর্ণনীয় বর্বরতায় পরিণত হয়েছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ বর্বরতা চলছে। সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মুসলিম পুরুষদের সুন্নৎকরা লিঙ্গ নিহত মুসলিম নারীদের মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার হিন্দু-শিখদের বেলাও ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে। এই বর্বরতাকে ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। তখনও ব্রিটিশ রাজশক্তি ছিল। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ নিবারণে তারা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট বা উৎসাহী ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের এত বিঘোষিত গুণ সত্ত্বেও (তাঁর জীবনীকাররা তাঁকে একেবারে স্বর্গে তুলেছেন !) এই সাম্প্রদায়িক বীভৎসতা অব্যাহত ছিল। আর ছিল মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের গোঁড়ামি।

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য মুসলিম লীগ ও জিন্নাকে পছন্দ করতেন না। প্রস্তাবিত পাকিস্তান দাবির (লণ্ডনের একজন মুসলিম ছাত্র রহমতুল্লা নাকি প্রথমে এই পাকিস্তান পরিকল্পনা করেছিলেন) প্রতি তাঁর কোনই সহানুভূতি ছিল না। কিন্তু জিন্নাকে পাকিস্তানের দাবি প্রত্যাহার করে নিতে তিনি কিছুতেই সম্মত করাতে পারলেন না। ১৯৪৭-এর এপ্রিল মাসের প্রথম দু সপ্তাহের মধ্যে মহম্মদ আলী জিন্নার সঙ্গে তিনি ছয়বার বৈঠক করেছিলেন। কিন্তু জিন্না ছিলেন অনড়। কোন যুক্তির কথাই তিনি শুনলেন না। অথচ জীবনে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার কিম্বা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোন কষ্টভোগ তাঁকে করতে হলো না। 'একটা টাইপরাইটার' এবং 'একজন কেরাণি মাত্র' সম্বলটুকু দিয়েই জিন্না স্বাধীন পাকিস্তান লাভ করতে অগ্রসর হলেন।

জিন্নার এই অনমনীয় গোঁয়ার্তুমির জন্য অবশেষে মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ষকে ভাগ কিম্বা পার্টিশন করার সিদ্ধান্তই নিলেন। তিনি জওহরলাল নেহরু এবং

বল্লভভাই প্যাটেলকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু পার্টিশনের ফলে পঞ্জাব ও বাংলা খন্ডনের দ্বারা যে পাকিস্তানের উদ্ভব হলো—তার মধ্যে ব্যবধান ঘটলো ৯৭০ মাইল এবং ভারতীয় ভূভাগের উপর দিয়ে এই পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আর জাহাজযোগে করাচী থেকে উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে পৌঁছতে কত দীর্ঘ সময় লাগবে? তবু এই 'কীটদষ্ট' অবাস্তব পাকিস্তানই জিন্নার চাই—যে পাকিস্তানের তিনি প্রথম গভর্ণর জেনারেলের অহমিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ মন্তব্য করেছিলেন যে, পার্টিশনের ফলে 'পূর্ববঙ্গ একদা বাংলাদেশে পরিণত হবে এবং ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ঘিঞ্জি নোংরা পল্লীতে পরিণত হবে।' অবশ্য আজ সে গণতন্ত্রহীন সামরিক শাসনে বন্দী। (সেই সময়)

মহম্মদ আলি জিন্নাকে Cold blood Logician বলে আমাদের যৌবনকালে বর্ণনা করা হতো। সত্যেনদা (আনন্দবাজার পত্রিকার স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রয়াত সম্পাদক) তাঁকে বাংলায় 'হিমরক্ত নৈয়ায়িক' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। সত্যেনদা সেই সময় কিছু কিছু প্রচলিত ইংরাজী কথার (তখন ঘোরতর ব্রিটিশ আমল) এমন বাংলা করেছিলেন, যেগুলি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যে অনায়াসে গৃহীত হয়েছে। যেমন, সেদিনকার ব্রিটিশ শাসনের পুলিসী অত্যাচারে কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামের বা শহরের কোন কোন অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপর দন্ড দ্বারা কালেকটিভ ফাইন জারি করা হতো। সত্যেনদা এর বাংলা করেছিলেন—'পাইকারি জরিমানা' কিম্বা আর একটি বহুল প্রচারিত পুলিসের 'mild lathi charge'-এর বাংলা করেছিলেন 'মৃদু যষ্ঠি সঞ্চালন'—এই বাংলা প্রতিশব্দ রচনা ও ব্যবহারের পিছনে সত্যেনদার যেন একটা বিদ্রূপাত্মক মনোভাবেরও প্রচ্ছন্ন প্রেরণা ছিল।

কিন্তু 'হিমরক্ত নৈয়ায়িক' পাকিস্তানের দাবিতে যতই একগুঁয়ে এবং অনড় থাকুক না কেন, তাঁরও একদা যৌবন ছিল এবং তাকে আমরা অবিবাহিত কিম্বা স্ত্রীসংসর্গশূন্য নিরাসক্ত মানুষ হিসেবে ভাবতেই অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁর জীবন কাহিনীতে দেখা যায় যে, জিন্নার রসকসহীন বাহ্যিক জীবনের আড়ালেও অন্তত কিছুকাল রোমান্টিক প্রেমের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। তাঁর যখন ৪১ বছর বয়স, তখন তিনি একবার দার্জিলিঙের বিখ্যাত মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে অবস্থান করেছিলেন। জিন্না ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যারিস্টার হিসেবে খ্যাতিমান। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম অবজ্ঞা ছিল। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও গণসমাবেশ দেখে তিনি ঘৃণায় নাসা কুঞ্চন করে বলতেন—কী জঘন্য, কতকগুলি ইতর লোক নিয়ে কারবার। এই জিন্নাই মাউন্ট এভারেস্ট হোটেলে ৪১ বছর বয়সে ১৭ বছরের একটি অতি সুন্দরী যুবতীকে দেখে গভীর-

ভাবে আকৃষ্ট হলেন। মেয়েটি তাঁর বন্ধুরই এক কন্যা ছিল এবং সেই সুন্দরীও জিন্নার প্রেমে মশগুল হলেন। জিন্না তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। সেই যুবতী ছিল বোম্বাইয়ের অত্যন্ত ধনাঢ্য এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেয়ে। তাঁর বাবা এই বিয়ের প্রস্তাব শুনেই মেয়ের প্রতি ক্ষেপে গেলেন এবং জিন্নার সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করার জন্য আইনের আশ্রয় নিলেন। মেয়েটি অত্যন্ত রূপবতী এবং এমন আঁটোসাটো পোশাক পরে ঘোরাফেরা করতেন যে, দৃশ্যটা যেন যৌন আকর্ষণের উৎস ছিল। সেই প্রেম উন্মাদিনী বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়েই জিন্নার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হলেন। দশ বছর তাঁরা সুখেই ছিলেন এবং একবার কী একটা অসুখে (কোলাইটিসের ব্যথা) অতিরিক্ত ওষুধের ডোজ খাওয়ার পর সেই সুন্দরী মারা গেলেন। জিন্না তারপর আর বিয়ে করেননি। এই জিন্নাই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু তখন কেউ জানতো না যে তিনি দুরারোগ্য টি বি রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই করাচির গভর্নর জেনারেলের প্রাসাদে তাঁর একমাত্র ভগ্নী ফাতিমা জিন্নার উপস্থিতিতে তিনি প্রায় সকলের অলক্ষিতে এবং নিঃশব্দে দেহত্যাগ করলেন। বোধহয় মাউণ্টব্যাটেনই এক সময় মন্তব্য করেছিলেন যে, তিনি যদি আগে জানতেন যে, জিন্না টি বি-তে আক্রান্ত, তবে, সেই সময় বোধহয় তিনি পার্টিশানে ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় রাজি হতেন না।

জিন্না বড়লোক এবং ফ্যাসন দুরস্ত নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন এবং যদিও তিনি মুসলমানদের নেতা সাজলেন, কিন্তু মুসলিম জন জীবনের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। তিনি রাত্রিবেলা হুইস্কি পান করতেন এবং তাঁর ১৫-১৬ জোড়া জুতা ছিল। অবশ্য এই সমস্ত কথা আমাদের যৌবনকালের সাংবাদিকতার সময় প্রচলিত ছিল। এগুলির কতটা সত্য তা আমাদের জানা ছিল না। তবে, এটুকু জানতুম নামকরা বড়লোকদের সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত এবং মুখরোচক গুজব প্রচারিত হয়ে থাকে। যেমন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন ব্যারিস্টার সি আর দাশ রূপে ভারতের আইনজ্ঞ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে খ্যাতিমান ছিলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে এমন গুজব খুব প্রচলিত ছিল যে, তাঁর জামাকাপড় (এমন কি মতিলাল নেহরুরও, দুজনেই অবশ্য স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন) প্যারিস থেকে ধুয়ে আসতো। পরবর্তীকালে দেশবন্ধুকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, এই সমস্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা গুজব। একেবারেই ভিত্তিহীন। অতএব জিন্নার বিলাস জীবন সম্পর্কে যে সমস্ত কথা চলতি ছিল, তার কতখানি সত্য সেকথা বলা কঠিন। কিন্তু একথা সত্য যে, জিন্নার জীবনে কোন প্রকার ত্যাগ ও জনগণের জন্য কষ্ট স্বীকারের বালাই ছিল না।

পাকিস্তানের জনক জিন্নার প্রসঙ্গে তাঁর অসুস্থতার কাহিনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই ভদ্রলোক কোনদিনই খুব সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন

না এবং স্থাপনও করে গেলেন এমন এক পাকিস্তানকে, যে দেশ গত ৪৩-৪৪ বছরেও সত্যকার গণতন্ত্রের মুখ দেখলো না। জিন্না যে অসুস্থ ছিলেন, একথা জানতেন মাউণ্টব্যাটেনের পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড ওয়েভেল। তিনি তাঁর ডায়েরিতে—১৯৪৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে জিন্নার অসুস্থতার কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। লিয়াকৎ আলিও এ খবর রাখতেন। আর জানতেন ফাতিমা জিন্না। কিন্তু বাকি জগতের নিকট এটা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। মাউণ্টব্যাটেনকে কেউ ঘুণাক্ষরে একথার আভাস পর্যন্ত দেননি। জিন্নাকে সিমলা থেকে বোম্বাই আসার পথেই নিদারুণ যক্ষ্মা এমন কাবু করেছিল যে, তাঁকে বোম্বাইয়ের সদর স্টেশনের বদলে পথিমধ্যে এক স্টেশনে নামিয়ে সোজা হাসপাতালে দেওয়া হল এবং বোম্বাইয়ের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ প্যাটেল তাঁকে গোপনে চিকিৎসা করে কোন মতে খাড়া করে তুললেন।

মাউণ্টব্যাটেন তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, একজন মানুষের প্রথম পরিচয় মুসলমান বা হিন্দু হিসেবে নয়। তাঁর প্রথম পরিচয় সে ভারতীয় এবং ভারতবাসী হিসেবেই তাঁকে প্রথম বিবেচনা করতে হবে।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের সব তীক্ষ্ম বুদ্ধি, বিদ্যাবত্তা ও কৌশলই জিন্নার অনমনীয় এক গোঁয়েমির কাছে ব্যর্থ হলো, 'He was the evil genius in the whole thing. The others could be persuaded, but not Jinnah.'—'ফ্রীডম অ্যাট মিডনাইট' গ্রন্থ।

সাংবাদিক জীবনের পাণ্ডুলিপি রচনা করতে গিয়ে যখন বিগত দিনগুলির কথা চিন্তা করি তখন দেখতে পাই যে, অন্তত গত ৬০ বছর ধরে ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট হিসেবে বাংলা (অখণ্ড বঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ) ও ভারতের অভূতপূর্ব নাটকীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, আসলে আমি ছিলাম চলমান ইতিহাসেরই সঙ্গী। কিন্তু কোন ডায়েরি বা নোট আমি রাখিনি। এমন কি, আমি যে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছিলাম, তারও কোন ডায়েরি রাখিনি। ফলে, একদিকে যেমন স্মরণশক্তি দিয়ে সার্চ লাইটের মত অতীত ঘটনাপুঞ্জের উপর আলোকপাত করতে হচ্ছে, তেমনি ইতিহাস গ্রন্থেরও আশ্রয় নিতে হচ্ছে। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও ভুল ও ত্রুটি ঘটার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। অবশ্য আমার বয়সী প্রত্যেক সাংবাদিক ও সম্পাদকের জীবনেই এই সমস্ত ঘটনাবলীর তরঙ্গ উঠেছিল। এই সমস্ত ঘটনা এত জটিল এবং একটির সঙ্গে অন্যটি এমন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে, প্রত্যেকটিকে আলাদা করে দেখা প্রায় অসম্ভব। আর তাছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলির এমন পঙ্কিল আবর্ত আছে যে, সেগুলিকে কোনক্রমেই বিশুদ্ধ বা নিষ্পাপ বলা যায় না। যেমন গান্ধীজীকে এড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ ও

সীতারামিয়ার পরাজয়ে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া—'সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়' এবং শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে কার্যত কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার কি গান্ধীজীর নিজের কিম্বা গান্ধীবাদীদের পক্ষে উচ্চ নৈতিক আদর্শের পরিচায়ক ছিল কিম্বা নীতির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য ছিল ?

পার্টিশানের কাহিনী পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, আসলে পার্টিশানের দায়িত্ব কেউ এড়াতে পারে না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যেমন দায়ী তেমনি দায়ী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিও। এই পার্টি অনেকদিন আগে থাকতেই আত্মনিয়ন্ত্রণের বা সেলফ্ ডিটারমিনেশনের ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলিম লীগের সঙ্গে সমানে পার্টিশানের দাবি করে আসছিলেন। মনে পড়ে তাঁরা জিন্নার জন্মদিনও বোধহয় পালন করেছিলেন এবং ক্রমাগত 'কংগ্রেস-লীগ এক হো' শ্লোগান দিচ্ছিলেন। গান্ধীজী অবশ্যই পার্টিশানের তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে, 'আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে পার্টিশান কার্যকর করা হবে।' নিঃসন্দেহে সুভাষচন্দ্রও পার্টিশানের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অধিনায়করূপে সেই নিদারুণ গোলমেলে সময়টায় তিনি ছিলেন ভারতের বাইরে এবং ১৯৪৫ সালের পর তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু গান্ধীজী আগাগোড়া পার্টিশানের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও চরম মুহূর্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পার্টিশানের পক্ষে তাঁর সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফ্ফর খান (প্রয়াত) ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্তম্ভিত হয়ে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে আর্তনাদ করে উঠলেন—'গান্ধীজী, আপনি আমাদের নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিলেন !' গান্ধীজী তখন মহাত্মাজনোচিত ঋষিবাক্য উচ্চারণ করলেন—'সত্যাগ্রহী পরাজয় কি, তা জানেন না !'

ভারতীয় উপমহাদেশে খান আব্দুল গফ্ফর খানের মত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য জীবন উৎসর্গকারী এবং দেশপ্রেমিক ও আদর্শবাদী নেতা আর কেউ ছিলেন বলে আমার জানা নেই। বলা বাহুল্য যে, তিনি সীমান্তের পাঠানদের অবিসম্বাদী নেতা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানে তিষ্ঠতে পারলেন না। তাঁকে আফগানিস্তানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো। স্বাধীনতার পর ভারতীয় শান্তি ডেলিগেশনের প্রতিনিধিমণ্ডলীরূপে আমরা একবার সোভিয়েত রাশিয়ার তাসখন্দ থেকে ফেরার পথে আফগানিস্তান হয়ে খাইবার গিরিপথের উপর দিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করছিলাম। আমরা কাবুলে যাত্রাভঙ্গ করলাম এবং সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ বীর পাখতুন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। কাবুল থেকে কিছু দূরে একটি সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়িতে তিনি অবস্থান করছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পার্টিশানের সেই বেদনার্ত কাহিনী স্মরণে আনলেন। সেই দৃশ্য আজও আমি ভুলিনি এবং ভুলতেও পারব না।

সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা যে, ভারত ব্যবচ্ছেদের দায়িত্ব কেউ এড়াতে পারেন না।

পার্টিশানের জন্য কেবল মহম্মদ আলী জিন্নার উপর দোষারোপ করা নিরপেক্ষ ইতিহাসসম্মত নয়। কারণ, স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী কি জিন্নাকে মাথায় তুলে কম নেচেছিলেন? মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মত দক্ষ কংগ্রেস সভাপতি এবং মণীষী ও অকৃত্রিম ভারত প্রেমিককে উপেক্ষা করে গান্ধীজী ১৯৪৪ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়েই জিন্নার সঙ্গে গায়ে পড়ে চিঠিপত্রের আদান প্রদান করলেন, তাঁকে তোষামোদ করলেন এবং নিতে উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ফলে, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি মৌলানা আজাদ পিছনে পড়ে গেলেন। কংগ্রেস সমর্থক জাতীয়তাবাদী ভারতীয় মুসলিমগণ দেখলেন যে স্বয়ং গান্ধীজী যখন জিন্নার পিছনে দৌড়চ্ছেন, তখন জিন্নাই ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের আসল প্রতিনিধি ও নেতা। অথচ এর আগে জিন্নার কোনই প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল না। শুধু তাই নয়, এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে জিন্নার কাঁধে হাত দিয়ে ফটো তুললেন। (এই ছবিটি খুব প্রচলিত হয়েছিল) এবং জিন্নাকে কয়েদে আজম বিশেষণে অভিহিত করলেন। ফলে কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা হতবাক হয়ে গেলেন এবং স্বভাবতই তাঁরা ধরে নিলেন যে, জিন্নাই মুসলিম সমাজের একমাত্র ত্রাণকর্তা ও প্রতিনিধি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর India wins Freedom বিখ্যাত বইতে গান্ধীর এসব কার্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করে মৌলানা আজাদ সমালোচনার ভঙ্গিতে বলেছেন—

"I think Gandhiji's approach to Mr. Jinnah on this occassion was a great blunder. It gave a new and added importance to Mr. Jinnah which he later exploited to the full. Gandhiji had in fact adopted a peculiar attitude to Mr. Jinnah from the very beginning. Mr. Jinnah had lost much of his political importance after he left the Congress in twenties. It was largely due to Gandhiji's acts of commission and ommission that Mr. Jinnah regained his importance in Indian political life. In fact, it is doubtful if Mr. Jinnah could ever have achieved Supremacy but for Gandhiji's attitude. Large sections of Indian Muslims were doubtful about Mr. Jinnah and his policy, but when they found that Gandhiji was continuously running after him and entreating him, many of them developed a new respect for Mr.

Jinnah. They also thought that he was perhaps the best man for getting advantageous terms in the communal settlement.'

গান্ধীজী কিভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানদের ডুবিয়েছেন মৌলানা আজাদের মত মণীষীর এই মন্তব্য থেকে যে কোন বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। মৌলানা আজাদ যে অপরিসীম সাহস ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে কংগ্রেসকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দিকে পরিচালনা করছিলেন গান্ধীজীর এই সমস্ত নির্বোধ ভালোমানুষীর ফলে তা পণ্ড হয়ে গেল। গান্ধীজী বোধহয় এভাবে জিন্নার 'হৃদয় পরিবর্তন' করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নার মত 'হিমরক্ত নৈয়ায়িক' এর পক্ষে সে আবেদনে সাড়া দেওয়া যে সম্ভব ছিল না, একথা গান্ধীজী বুঝতে পারেননি। ফলে সমস্ত বিভ্রাট বেধে গেল। ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ভারতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরমে উঠতে লাগল। শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বর্বর হত্যাকাণ্ডের ফলে জওহরলাল নেহরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেল যখন এই দানবতার থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে ভারত খণ্ডনে রাজি হলেন, তখন গান্ধীজীর পক্ষেও সম্মতি না দিয়ে উপায় ছিল না। তবে যে পাষাণকঠিন দৃঢ়তা তিনি অন্যান্য প্রশ্নে দেখিয়েছিলেন, সেই দৃঢ়তা যদি তিনি ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে দেখাতে পারতেন তবে বোধহয় ইতিহাসের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচিত হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পার্টিশানের দায়িত্ব কেউ এড়াতে পারেন না।

আমরা সাংবাদিকরা অনুভব করছিলাম গান্ধীজী যেন ক্রমশই কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেল পার্টিশনের প্রস্তাব সমর্থন করায় গান্ধীজীর যেন দুই বাহু ভেঙ্গে গেল এবং যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পার্টিশনের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, এমন কি তাঁকে প্রস্তাব প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ পর্যন্ত করেছিলেন, তথাপি সেদিনের বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে এমন প্রস্তাব না গ্রহণ করে উপায় ছিল না এবং নেহরু ও প্যাটেলের সমর্থনের পর গান্ধীজীর পক্ষেও এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু এর ফলে মানসিক দিক থেকে গান্ধীজী যেমন হতাশাগ্রস্ত হলেন, তেমনি ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ, তাঁর পার্টিশনে বিরোধিতা, তাঁর হিন্দু মুসলিম ঐক্যের বাণী এবং মহম্মদ আলি জিন্নার 'হৃদয় পরিবর্তনের' চেষ্টা সমস্ত কিছুই যেন পণ্ড হয়ে গেল।

এদিকে ব্রিটেন কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসন্ন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে সারা ভারত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা সেই সময়কার ভারতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে লিখেছিলেন, লাহোরের উত্তর দিকে সোনপুর নামক একটি ব্যবসায়িক শহরের এক গুদামঘরে সহস্র হিন্দু ও শিখ অধিবাসীদের আটক করে রাখা হলো এবং তারপর মুসলিম পুলিস ও ফৌজ থেকে পলাতক সৈন্যরা মেসিনগান দিয়ে সেই অসহায় লোকগুলিকে হত্যা করলো। ট্রেন থেকে নামিয়ে কত যাত্রীকে যে খুন করা হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই। ভারতে তখন বৃষ্টিপাতের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে রক্তপাত হচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ লর্ড মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সারা দেশে এক অদ্ভুত আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের হিল্লোল বয়ে গেল। ১৫ আগস্ট দিল্লির রাস্তায় শুনা গেল—'জানো না ইংরেজরা চলে যাচ্ছে। নেহরু নতুন পতাকা তুলছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি!' দিল্লি, বোম্বে, মাদ্রাজ, বারাণসী, শিলং ইত্যাদি ভারতের সমস্ত শহরে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি শুনা গেল। দেড়শ' বছর ধরে যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশিত হচ্ছিল, তা যেন মুহূর্তে উবে গেল এবং বৃটেনের প্রতি, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রতি প্রচুর সদিচ্ছার অভিব্যক্তি দেখা গেল। এমন কি উল্লাসে মত্ত জনতা যখন এক সময় জয়হিন্দ ধ্বনির দ্বারা মাউন্টব্যাটেনকে সংবর্ধনা জানালেন, তখন মাউন্টব্যাটেনও প্রত্যুত্তরে জয়হিন্দ ধ্বনি উচ্চারণ করে জনতাকে প্রত্যাভিবাদন জানালেন। সমস্ত জেলের দরজা খুলে দেওয়া হলো, স্বাধীনতা উপলক্ষে সব কয়েদী এবং দণ্ডিত বন্দীরা মুক্তি পেয়ে গেল। সর্বত্র হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান একত্র হয়ে স্বাধীনতার জন্য হর্ষধ্বনি করতে লাগলো। আমি নিজে এবং সাংবাদিকরা, নাগরিকরা সকলেই এই দৃশ্য দেখে অভিভূত বোধ করলেন।

কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের এই প্রবল আনন্দ উচ্ছ্বাসের আড়ালে সারা ভারতের জন্য যে ভয়ঙ্কর নিয়তি অপেক্ষা করছিল, সিরিল র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারাই যেন সেটাকে এক মর্মান্তিক পরিণতির মত সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। Cyril Radcliff একজন ধুরন্ধর ব্রিটিশ আইনবিদ ছিলেন এবং তিনি পাকিস্তান ও ভারতের সমস্ত সীমানা তাঁর দলিলে চিহ্নিত করলেন, চতুর মাউন্টব্যাটেন সেটা স্বাধীনতার উৎসব ও উচ্ছ্বাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে এক গোপনীয় দলিলের মত সিন্দুকে লুকিয়ে রাখলেন। যখন এই দলিল প্রকাশ করা হলো, তখন পঞ্জাব ও বাংলার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বাংলায় এমনভাবে সীমানা ভাগ করা হলো যে, উভয় অংশেরই অর্থনৈতিক সর্বনাশ সুনিশ্চিত হলো। যেমন—পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ

পাট যে অঞ্চলে উৎপন্ন হয়ে থাকে সেটা পড়লো পূর্ব পাকিস্তানের অংশে। কিন্তু এই বিপুল পাটের সম্ভার মিলজাত করবার জন্য সেখানে একটি কারখানাও ছিল না। যথা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার তীর ধরে শত শত পাটকল চটকল গজিয়ে উঠেছে এবং কলকাতা বন্দর থেকে সেই পাট জাহাজে বোঝাই হয়ে পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানি করা হতো, কিন্তু র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারার ফলে কলকাতা বন্দরের কপালে কোন পাট জুটতো না। এই বিকট অর্থনৈতিক সর্বনাশের চেহারাটা শিক্ষিত লোকের অনুধাবনের জন্য। কিন্তু দুই অংশের সাধারণ মানুষই হতভম্ব হয়ে দেখলেন যে, র‍্যাডক্লিফ সাহেব এমনভাবে সীমানা চিহ্নিত করেছেন যার ফলে কারুর রান্নাঘর পড়লো পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু বৈঠকখানা পড়লো হিন্দুস্তানে। সুতরাং সর্বত্র যেন একটা প্রচণ্ড বিভ্রাট ও দুর্বিপাকের শুরু হলো।

পঞ্জাবেও বাঁটোয়ারার ফলে অনুরূপ বিভ্রাট ঘটলো। সেই থেকে গর্বিত শিখরা তিক্ত, ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে পঞ্জাবের বিয়োগান্ত নাটকের আজও অংশীদার হয়ে রয়েছে। শিখরাও কিন্তু পার্টিশনের মুহূর্ত থেকেই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার চেয়েছিলেন এবং 'স্বাধীন শিখস্তানের' দাবি করেছিলেন। কিন্তু সেই দাবি পূর্ণ হওয়া দূরের কথা র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা তাঁদের বহু দুর্গতির কারণ হয়ে রইলো। এখনও পঞ্জাবে যে ভয়ংকর রক্তারক্তি চলছে, তার একেবারে মূল সন্ধান করলে র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার এবং 'শিখস্তানের' দাবিকে ইতিহাসের দিক থেকে স্মরণ না করে উপায় নেই।

র‍্যাডক্লিফের বিরুদ্ধে সমস্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এমন তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা উচ্চারিত হলো যে, আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর পরিশ্রমের জন্য তাঁকে যে দুই হাজার পাউণ্ড ফী হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, র‍্যাডক্লিফ গভীর অসন্তোষ ও অবজ্ঞার সঙ্গে সেই টাকা ফেরত দিলেন।

এদিকে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবের ঢেউ যেন র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার পর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিহারে, পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষভাবে কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তান) সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও প্রচণ্ড উপদ্রব আত্মপ্রকাশ করল। বলা বাহুল্য যে, গান্ধীজী এই ঘটনায় এত বিচলিত হলেন যে, তিনি যেন এক নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রীর মত কলকাতার দিকে যাত্রা করলেন। বেলেঘাটার হায়দরী গৃহে তাঁর যে অবস্থান সেটা ভারতের সেদিনের ইতিহাসে এক অদ্ভুত স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত ও ক্ষান্ত করার জন্য তিনি একাই কলকাতার দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর সেই সময়কার একক ঐতিহাসিক যাত্রাকে স্মরণ করলে মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গান—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলোরে।' পরবর্তীকালে গান্ধীজী তাঁর আর এক ঐতিহাসিক অনশন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের এই

অমর গানটি স্মরণে এনেছিলেন। গান্ধীজী যখন কার্যত নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং যখন তিনি একেবারেই নিঃসঙ্গ, তখন থেকেই তাঁর এই একলা চলার ঐতিহাসিক পর্ব শুরু হল।

ভারত ব্যবচ্ছেদ বা পার্টিশন নিয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে এবং তখনকার সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি বলেছিলাম যে, পার্টিশনের দায়িত্ব কেউ এড়াতে পারে না। তবু বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনা করতে হলো। শিলংয়ের সুপরিচিত সাংবাদিক রণজিৎ নাগ যিনি স্থানীয় ফ্রণ্টিয়ার টাইমস পত্রিকার সঙ্গে জড়িত এবং একদা আমার শিলং পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল, তিনি লিখেছেন যে, পার্টিশান সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীও ধোয়া তুলসিপাতা নন, যদিও তিনি সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে পার্টিশান কার্যকর করা হবে। কিন্তু এটি ছিল তাঁর ফাঁকা আওয়াজ। কারণ, ১৯৪৪ সালেই গান্ধীজী পার্টিশানের কথা ভেবেছিলেন। এই সম্পর্কে রণজিৎ নাগ সেদিনের সুবিখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক মিঃ শিব রাওয়ের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত ইংরেজী পুস্তক থেকে যে দুটি মূল্যবান উদ্ধৃতি আমাকে পাঠিয়েছেন, এখানে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এই ইংরেজী পুস্তকে শিব রাও বলেছেন—

"আমার মনে আছে ১৯৪৪ সালে সেবাগ্রামে এক অন্ধকার রাতে গান্ধীজী উদ্বিগ্ন ভাবে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুকে তাঁর কুটিরে আহ্বান করেছিলেন। গান্ধীজীর সমস্ত কংগ্রেসী সহকর্মী তখনও জেলে বন্দী। কিন্তু গান্ধীজী একটি ফর্মুলা তৈরি করে রেখেছিলেন, যেটি নিয়ে তিনি পরবর্তী কালে বোম্বাইতে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে ইচ্ছুক ছিলেন। গান্ধীজী এই ফর্মুলা সম্পর্কে স্যার তেজবাহাদুরের নিকট জানতে চাইলেন যে, এর দ্বারা কি পাকিস্তান সৃষ্টি মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

সেদিন ওখানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন ভুলাভাই দেশাই, তিনি পিছনে বসেছিলেন একজন নিঃশব্দ, কিন্তু উৎসুক শ্রোতা হিসেবে। স্যার তেজবাহাদুর যখন বললেন যে, এই ফর্মুলার দ্বারা ভারত ব্যবচ্ছেদের কথাই বোঝা যাচ্ছে তখন এই ব্যাখ্যা শুনে গান্ধীজী বিমর্ষ হলেন। তবে, গান্ধীজীর সৌভাগ্যক্রমে বোম্বাইতে জিন্নার সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনার পরেও কোন পক্ষই কোন সম্মতিতে পৌঁছুতে পারলেন না।"

"কিন্তু ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, গান্ধীজী জিন্নার নিকট এক চিঠিতে লিখলেন যে, দেশ বিভাগের নীতি মেনে নিতে প্রস্তাবিত অঞ্চলগুলির প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ইচ্ছার উপরেই তার ভিত্তি করতে হবে এবং এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে ঃ

"There shall be a treaty of separation which should also provide for the efficient and satisfactory administration of foreign affairs, defence, internal communications, customs, commerce and the like which must necessarily continue to be matters of common interests between the contracting parties. The treaty shall also contain terms for safeguarding the rights of minorities in the two States.

"Gandhiji repeated this suggestion in an interview to the London NEWS CHRONICLE on 29th September, 1944. He told the correspondent in New Delhi :

It was my suggestion that provided there was the safeguard of a plebiscite there would be sovereignty for the predominantly Muslim areas ; but it should be accompanied by bonds alliance between Hindusthan and Pakisthan. There should be a common policy and a working arrangement on foreign affairs, defence and communications and similar matters. It is manifestly vital to the welfare of both parts of India."

গান্ধীজী জিন্নার কাছে যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪, সেটিরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন লণ্ডনের বিখ্যাত নিউজ ক্রনিক্যাল পত্রিকার ভারতস্থিত সংবাদদাতার নিকট।

মিঃ শিব রাওয়ের মত খ্যাতিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন সাংবাদিকের এই স্মৃতি-চারণাকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা উচিত।

তবে এই সমস্ত উদ্ধৃতির অর্থ এই নয় যে, ভারত বিভাগের জন্য গান্ধীজীই দায়ী ছিলেন। কারণ, আবারও ব্যক্তিগতভাবে দৃঢ় ধারণা যে, নীতিগতভাবে গান্ধীজী ভারত খণ্ডনের একান্ত বিরোধী ছিলেন। কিন্তু 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হওয়ার মত গান্ধীজীকেও শেষ পর্যন্ত এই তিক্ত বটিকা গলধঃকরণ করতে হয়েছিল। যার জন্য ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি নিজের জীবন দিয়ে তাঁকে চরম প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের জননেতা শ্রদ্ধেয় অতুল্য ঘোষের মতামতকে নিশ্চয়ই প্রামাণিক বলে ধরা যেতে পারে। কারণ, অতুল্যবাবু আজীবন কংগ্রেসী, অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং বিদ্যাবত্তাসম্পন্ন নেতা ছিলেন। দেশ পত্রিকার কংগ্রেস শতবর্ষ সংখ্যায় অতুল্য ঘোষ লিখেছেন :

"তখনকার দিনের বাস্তব পরিস্থিতির উপর যাদের জ্ঞান নেই, তারাই ভারত বিভাগের জন্য গান্ধীজীকে দায়ী করেন। কিন্তু এর জন্য মূলত দায়ী ছিল

প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টি। দ্বিতীয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও তৃতীয় মুসলিম লীগ। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরুদ্ধেও কমিউনিস্ট পার্টি সোচ্চার ছিল....
রামানন্দবাবুর (প্রখ্যাত প্রবাসী সম্পাদক) এই প্রসঙ্গের লেখা পড়ে দেশবাসী বুঝতে পারলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি কিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাধা দিচ্ছিল এবং দেশ বিভাগের চেষ্টা করছিল।

"সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, তখনকার প্রায় সব রাজনৈতিক দল ভারত বিভাগের পক্ষে মত দিয়েছিল। ভারতীয় জনসঙ্ঘের স্রষ্টা শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদবাবু বহু জায়গায় ভারত বিভাগের স্বপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

"এটা সত্য যে, কংগ্রেসও এই ব্যাপারে দায়ী এবং কংগ্রেস তা অস্বীকার করে না। অথচ অপর সব দলই জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য ক্রমে ক্রমে সরে এসে কংগ্রেসের ঘাড়েই দোষ চাপায়।"

অতুলবাবু আরও উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীর বহু দেশই এভাবে বিভক্ত হয়েছে, যেমন আয়ারল্যাণ্ড, কোরিয়া, জার্মানি এমন কি বার্লিনের মত শহর পর্যন্ত। তিনি তাঁর প্রবন্ধে সেদিনের পিপলস্ ওয়ার (কমিউনিস্টদের মুখপত্র) থেকে একটি ম্যাপ ছেপে দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কমিউনিস্টরা কিভাবে বাংলার অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে পার্টিশান সেভাবে হয়নি, যদি হতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গের আরও সর্বনাশ হতো।

এই প্রসঙ্গে অতুল্য ঘোষ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে পঞ্জাবের মত Exchange of population বা অধিবাসী বিনিময়ের দাবির বিরুদ্ধে বাংলার জনমতই বিরোধিতা করেছিলেন।

কিন্তু আরও একটি অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য উল্লেখ করেছেন, সেটা সাধারণত উপেক্ষিত। সেটি হচ্ছে এই যে, ভারত অনেক জমি হারিয়েছে এটা যেমন সত্য তেমনি লক্ষাধিক বর্গমাইলেরও বেশি পাওয়াও গেছে। ভারতবর্ষের গেছে ৪,৪২,৫৯৬ বর্গ মাইল আর ভারতবর্ষে এসেছে ৫,৩৮,৩৯৬ বর্গ মাইল। অবশ্য এই আয়তনের সঙ্গে আরও যুক্ত হবে নবনগর রাজ্য ও পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চল—যে অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে গোয়া, দমন, দিউ এবং ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর।

স্বাধীনোত্তর ভারতের আয়তন লক্ষাধিক বর্গ মাইল বেড়েছে।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য মনে রাখলে কংগ্রেসকে একতরফা দোষারোপ করা ও গালাগালি দেওয়া নিশ্চয়ই অজ্ঞতা কিম্বা বিদ্বেষের মনোভাবের পরিচায়ক হবে।

বাইরে থেকে গান্ধী চরিত্রকে অনেক সময় যত সহজ ও সরল মনে হয়,

আসলে তা নয়। এই চরিত্র বেশ জটিল এবং এত বৈপরিত্যপূর্ণ যে, অনেকেই তাঁকে 'বান্ডিল অব কন্ট্রাডিকশন' বলে অভিহিত করেছেন। আমার ধারণা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে এত মেশাবার ফলেই এই ধরণের বৈপরিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অহিংসবাদী, অথচ কাশ্মীর রক্ষার জন্য ভারত সরকারের অস্ত্র ধারণে তিনি আপত্তি করেননি। এদিকে ইতিহাসে দেখা যায় কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যাতে পরিপূর্ণ যুদ্ধ না বাধে, তার জন্য তাঁর উদ্বেগের সীমা ছিল না। এমনকি এজন্য তিনি তদানীন্তন নিয়মতান্ত্রিক গবর্নর জেনারেল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের উপর অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। কাশ্মীরের বিরোধকে ইউনাইটেড নেশন্স'এর বা রাষ্ট্রসংঘের সালিশীর কিম্বা বিচারাধীন করার উদ্দেশ্যে তিনি জওহরলাল নেহরুর উপর প্রচণ্ডতম চাপ সৃষ্টি করলেন। এই বিষয়ে মাউন্টব্যাটেন তাঁর সহায়ক হলেন। এমন কি তিনি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেট অ্যাটলিকে ভারতে এসে পাক-ভারত দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সালিশী করার জন্য পর্যন্ত প্রস্তাব করেছিলেন। যদিও কাশ্মীর উপলক্ষে দিল্লির সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া আবার ঘোলাটে হয়ে উঠলো! তবু দিল্লিকে তা থেকে মুক্ত করাই এবার গান্ধীজীর মুখ্য উদ্দেশ্য হল না। তিনি তখন জানুয়ারী মাসের ঠান্ডায় দিল্লিতে বিড়লা ভবনে অবস্থান করছিলেন এবং মাঝে মাঝে বিড়লা ভবনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণের খোলা রৌদ্রে খড়ের বালিশে মাথা রেখে রৌদ্র পোহাতেন।

এমন সময় ১৮৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারি আমরা সাংবাদিকরা হতভম্ব হয়ে শুনলাম যে, পাকিস্তানকে তাদের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার দাবিতে গান্ধীজী আমৃত্যু অনশনের সংকল্প করেছেন। এই বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন মাউন্টব্যাটেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শপূর্বক তিনি স্থির করেছিলেন যে, পাকিস্তানকে তাদের পাওনা ৫৫ কোটি টাকা অবিলম্বে শোধ করে দেওয়া স্বাধীন ভারতের নৈতিক কর্তব্য এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব। কিন্তু গান্ধীজীর সবচেয়ে দুই নিষ্ঠাবান শিষ্য ও সমর্থক জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। তাঁরা যুক্তি দেখালেন যে, এই ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে পাকিস্তান নতুন সমরাস্ত্র কিনবে এবং কাশ্মীর উদ্ধারের জন্য সেগুলি নিয়োগ করবে। অধিকন্তু পাকিস্তানের কাছে ভাগবাঁটোয়ারা বাবদ যে ৮০ কোটি টাকা ভারতের পাওনা আছে, সেটা আগে শোধ করুক, আমরাও ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দেব। কিন্তু গান্ধীর কাছে এই সমস্ত বাস্তব যুক্তি গ্রহণীয় হলো না। মাউন্টব্যাটেনের কাছে আগেই তিনি ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁর আমৃত্যু অনশনের সংকল্প ঘোষিত হলেই ভারত সরকার টাকাটা দিয়ে দেবে। গান্ধীজী সেই সংকল্প ঘোষণা করলেন।

আমরা সত্যি সত্যি অবাক হলুম। কারণ, যেখানে নেহরু প্যাটেল অসম্মতি করছেন ও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সেখানে গান্ধীজী পাকিস্তানের পক্ষে এমন আব্দার তুলেছেন কেন?

এই গান্ধী চরিত্র অতি বিচিত্র সন্দেহ নেই। তিনি নীতিগতভাবে আগাগোড়া ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। অথচ ১৯৪৪ সালেই জিন্নার পিছন পিছন গিয়ে তাঁর খোসামোদ করলেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে উপেক্ষা করলেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ভারত ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব সমর্থন করলেন। সীমান্তের বীর পাঠানদের নেতা আব্দুল গফফর খানকে অকূলে ভাসালেন। কই চরম মুহূর্তে ভারত ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব প্রতিরোধের জন্য তিনি তো আমৃত্যু অনশন ঘোষণা করলেন না? মাউণ্টব্যাটেনকে নিরস্ত করার জন্যও তিনি অনশন করলেন না। বরং তাঁর সঙ্গে বুঝাপড়ার সম্পর্কই গড়ে তুললেন। কিন্তু এখন পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা পরিশোধ করার দাবিতে তিনি আমৃত্যু অনশন ঘোষণা করলেন।

বোধহয় এই তাজ্জব নাটকের শেষ অঙ্ক দেখার জন্যই তখন দিল্লিতে দেশ-বিদেশের বাঘা বাঘা সাংবাদিকরা সমবেত হয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রের এই অদ্ভুত বৈপরিত্য আজও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে ভারত ব্যবচ্ছেদ কার্যকর হবে। সেই ব্যবচ্ছেদ যখন বাস্তব মূর্তিতে দেখা দিল এবং দুই স্বাধীন ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হল তখন তিনি মৃত্যুপণ করে বাধা দিলেন না। কিন্তু পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দেওয়ার দাবিতে অনশন শুরু করলেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন এটা কি মহাত্মার পক্ষে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল নয়? কিন্তু অনশনের দিন পাঁচেকের মধ্যেই নেহরু-প্যাটেলকে নতি স্বীকার করতে হল তাঁদের গুরুর কাছে এবং পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। কলিকাতার পর দিল্লিতে গান্ধীজীর দ্বিতীয়বার জয় হল। কিন্তু এটা কি সত্যি জয়?

কিন্তু এই প্রশ্ন একা আমার নয়, বোধহয় অনেক বুদ্ধিজীবী ঐই প্রশ্ন তুলবেন। গান্ধীজী পাকিস্তানের মত একটা সাম্প্রদায়িক ও আধা-ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রকে ৫৫ কোটি টাকা পাইয়ে দেবার জন্য অনশনে তনুত্যাগের ভীতি প্রদর্শন করলেন এবং ভারত সরকারকে নতি স্বীকার করালেন। দিল্লির বিড়লা ভবনে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজীর সুদীর্ঘ অহিংস সংগ্রামী জীবনের এটাই ছিল শেষ অনশন। কিন্তু এর ফলেই কি শেষ পর্যন্ত ৩০শে জানুয়ারি গান্ধীজীকে নিজের জীবন দিয়ে চরম মূল্য দিতে হয়নি? কিন্তু যাঁদের জন্য তাঁর এই আত্মাহুতি সেই পাকিস্তানের হৃদয়ের কি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেছিল? তাঁরা কি গান্ধীজীর এই আত্মোৎসর্গের প্রতি সম্মান

দেখাবার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কিম্বা জনসভায় ও সম্মেলনে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করেন ? এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রচুর বুদ্ধিজীবী ও জনগণ আছেন। কিন্তু পাকিস্তান সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ। হিন্দুস্তান বা ভারতের প্রতি বিদ্বেষই ঐস্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের মূল মন্ত্র। সেই রাষ্ট্রের পাষাণ হৃদয়কে গান্ধীজীর অনশনের দ্বারা কোনভাবেই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। এটাই কিন্তু গান্ধী জীবনের অন্যতম ট্র্যাজেডি।

দুরাত্মা ও মহাত্মার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখা গেল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডবে তখন ভারত বিধ্বস্ত। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও এতটা কল্পনা করতে পারেননি। মাউণ্ট-ব্যাটেন ভেবে দেখলেন কলকাতায় যদি দাঙ্গা লাগে তবে, কলকাতার বস্তি ও ঘনবসতিপূর্ণ বাজার এলাকাগুলিতে সেই বিদ্বেষাগ্নি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, কেবল সৈন্য পাঠিয়ে তা নির্বাপিত করা কোন মতেই সম্ভব হবে না। এমন কি, পঞ্জাবের চেয়েও ভয়ঙ্কর অবস্থার উদ্ভব হবে। সুতরাং তিনি জুলাই মাসেই গান্ধীজীর শরণ নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আমি পঞ্জাবে সৈন্যবাহিনী দিয়ে যা করতে পারিনি, আপনি একাই কলকাতায় সেই শান্তি রক্ষার কাজ করতে পারবেন—'You will be my one man boundary force'—অর্থাৎ আপনি একাই একটা গোটা বাহিনীর কাজ করতে পারবেন।

গান্ধীজী রাজি হলেন না, বললেন—'বন্ধুবর এবার দেখুন আপনার পার্টিশানের কী ফল ?'

গান্ধীজী আগেই ঠিক করেছিলেন তিনি ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে যোগ দিবেন না। বরং উপবাসে ও প্রার্থনায় দিন কাটাবেন। কারণ, পার্টিশানের রক্তকলঙ্কিত এমন স্বাধীনতা বা স্বরাজ তাঁর স্বপ্নের মধ্যে ছিল না। তিনি নোয়াখালিতে বিপন্ন ও আতঙ্কিত হিন্দু সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াবার সঙ্কল্প স্থির করেছিলেন। এই সময় একজন মুসলিম মহিলা তাঁকে বলেছিলেন যে, দুই ভাই যদি পৃথক হয়ে আলাদা আলাদা থাকতে চায় তাতে আপনার এত আপত্তি কেন ?

গান্ধীজী জবাব দিয়েছিলেন, বোন, এই পার্টিশান দুই ভাইয়ের আলাদা হওয়ার মত নয়, এটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ দুই প্রতিপক্ষের দুটি বিবদমান শিবির গড়ে তোলার মত। এর ফলাফল ভয়াবহ হবে। (ফ্রীডম অ্যাট মিড নাইট্)।

গান্ধীজী চলে গেলেন সোদপুর আশ্রমে--তাঁর একান্ত শিষ্য সতীশ

দাশগুপ্তের কাছে। এদিকে শহিদ সুরাবর্দি প্রমাদ গণলেন। এবার কলকাতার হিন্দুরা তাঁর ঘোষিত ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬) প্রতিশোধ নিশ্চয়ই নেবে, যে সংগ্রামের ফলে কলকাতার ৬ হাজার নির্দোষ নর-নারী খুন হয়েছিল। আর সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কত কত লোক নিহত হয়েছিল, সেই সংখ্যা কোনদিনই স্থির করা যাবে না। আমরা সাংবাদিকরা বিভিন্ন সংবাদপত্রে সেই সময় বৃথা গবেষণা করেছিলাম। তবে, কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সারা ভারতে নিহতের সংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ পর্যন্ত হবে।

সুরাবর্দি এবার নার্ভাস বোধ করলেন। এই সেই কুখ্যাত সুরাবর্দি, যিনি মহাত্মার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র রূপে দুরাত্মা বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন। মদ্য, উচ্চশ্রেণীর গণিকা এবং নাইট ক্লাব ও ক্যাবারে নর্তকীরা ছিল তাঁর বড় খোরাক। যখন পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন, তখন গুণ্ডা দলের সর্দার এই সুরাবর্দি অনশনক্লিষ্ট লোকদের বঞ্চিত করে সমস্ত চাল ও শস্যের কালোবাজারি করে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা কামিয়েছিলেন। গান্ধীজীর শুচিতা, শুভ্রতা, প্রেম ও মানব মহত্বের এবং অহিংস আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে ছিলেন সুরাবর্দি।

কিন্তু এই কঠোর হৃদয়, মদ ও মেয়ে মাতাল সুরাবর্দি প্রচণ্ডভাবে ভীত হলেন কলকাতার হিন্দুদের প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কায়। সুতরাং তিনি ছুটলেন সোদপুর আশ্রমে গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রার সন্ধিক্ষণে। সুরাবর্দি তাঁর কাছে করুণ আবেদন করে বললেন—'আপনার কাছে হিন্দু ও মুসলমান দু' পক্ষেরই সমান দাবি আছে। সুতরাং আপনি কলকাতায় এসে মুসলমানদের রক্ষা করুন।'

গান্ধীজী জবাব দিলেন যদি তাঁকে কলকাতায় অবস্থান করতেই হয়, তবে, তাঁকে দুটি শর্ত পালন করতে হবে। প্রথমত, সুরাবর্দিকে নোয়াখালির মুসলমানদের কাছ থেকে এই মর্মে পবিত্র প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে যে, হিন্দুরা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। যদি একজন হিন্দুও খুন হয়, তবে, গান্ধীজীর পক্ষে অনশনে তনু ত্যাগ ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

সুরাবর্দির ঘাড়ে কী ভয়ঙ্কর নৈতিক দায়িত্ব চেপে বসলো। কিন্তু অসহায় সুরাবর্দি গান্ধীজীর কাছে এই প্রতিশ্রুতিই দিলেন।

দ্বিতীয় শর্ত হলো এই যে, তিনি কলকাতায় অবস্থান করতে সম্মত আছেন, কিন্তু সুরাবর্দিকেও তাঁর সঙ্গে কলকাতার নোংরা বস্তিতে দিনরাত এক সঙ্গে বাস করতে হবে পাশাপাশি—কোন প্রকার অস্ত্র সঙ্গে রাখা চলবে না। কোন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও চলবে না। শহরের শান্তি রক্ষার জন্য দুজনকেই জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

সুরাবর্দি এই দুই শর্তই মেনে নিতে রাজি হলেন। কথায় বলে—ঠেকায় পড়লে বাঘেও ধান খায়। সুরাবর্দির যেন সেই অবস্থা হলো।

আজ বেলেঘাটার হায়দরি ভবন ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক ও আত্মিক জয়ের প্রতীক হিসেবে এই ভবনটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে সুন্দররূপে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে এই গৃহে অবস্থান করা দূরের কথা কোন ভদ্রলোক এখানে ঢুকতেও চাইতেন না। অত্যন্ত নোংরা, আবর্জনাপূর্ণ এবং বীভৎস পরিবেশের মধ্যে ছিল বেলেঘাটার এই হায়দরি ভবন। সেখানে মহাত্মা ও দুরাত্মার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ঘটল। এ এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। ৫০০ বছর আগে এই বঙ্গভূমিতে শ্রীচৈতন্য তাঁর আশ্চর্য মানবপ্রেমের ও সংকীর্তনের দ্বারা জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও তেমনি তাঁর প্রার্থনা, অহিংসা ও আত্মিক শক্তির দ্বারা সুরাবর্দিকে উদ্ধার ও কলকাতার মুসলমানদের রক্ষা করলেন।

এই সময় কলকাতায় যে সমস্ত সাংবাদিক মহাত্মা গান্ধীকে বেলেঘাটার সেই নোংরা বাড়িতে দেখেছিলেন, তাঁরা অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন যে, ৭৭ বছর বয়সেও গান্ধীজীর সমস্ত মুখমণ্ডলে যেন জ্যোতির্ময় বিভা বিকশিত হয়েছিল। যেন এক দিব্যকান্তি তাঁর সর্বাঙ্গে! অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি আদৌ সুপুরুষ ছিলেন না—যদিও তাঁর হাসি ছিল ভুবনভুলানো।

বেলেঘাটায় গান্ধীজীর এই ঐন্দ্রজালিক কিম্বা যাদুকরের মত কাজের জন্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন—সবই ভগবানের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছার কাছে আমরা পুতুল মাত্র।

এর আগে কলকাতার ময়দানে আরও এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। সেখানে ৯৪ লক্ষ মুসলমান জমায়েত হয়েছিলেন ঈদ্ উপলক্ষে। মহাত্মা গান্ধী সেই জমায়েতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। লক্ষ লক্ষ মুসলমান হর্ষধ্বনির দ্বারা তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন। সেদিন ছিল সোমবার, গান্ধীজীর মৌনব্রত পালনের দিন। কিন্তু সেদিন তিনি এক বিশাল মুসলমান সমাবেশে তাঁর মৌন ভঙ্গ করে উর্দুতে জানালেন—ঈদ্ মোবারক!

এভাবে মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের এক একটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত পৃষ্ঠা যেন একে একে উদ্ঘাটিত হচ্ছিল। কিন্তু সেই সময় আমরা সাংবাদিকরা এক গভীর তাৎপর্য এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল উপলব্ধি করতে পারিনি—একথা আজ গভীর লজ্জার সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। পৃথিবীতে তিনি এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট ও শ্রীচৈতন্যের পর এমন প্রেম ও আত্মিক জয়ের দৃষ্টান্ত এর আগে দেখা যায়নি। সে জন্যই বিংশ শতকের পৃথিবীতে এক দিকে যেমন সোভিয়েত রাষ্ট্রের লেনিন, অন্যদিকে তেমনি ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী অতুলনীয়। এই

দুই ব্যক্তিই পণ্ড মহাদেশে যেন পঞ্চপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। আমরা ধন্য যে এই শতাব্দীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই ভারতভূমিতে প্রায় কাছাকাছি সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'মহামানবের সাগর তীরে' যেন নতুন তীর্থ রচনা করে গেছেন।

যদিও আমি সেদিনকার সাংবাদিকদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আগে লিখেছিলাম যে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য গান্ধীজীর আমৃত্যু অনশনের ফলে পাকিস্তানের হৃদয়ে কোন রেখাপাত হয়নি, তবু পরবর্তীকালের প্রকাশিত ইতিহাসে দেখা যায় যে, গান্ধীজীর এই অনশনের সংবাদ পাকিস্তানে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু মুসলিম নর-নারী বিচলিত হয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের প্রতি গান্ধীজীর এই ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাবের জন্য অনেকেই বেশ বিচলিত হয়েছিলেন। এমনকি মসজিদে মসজিদে গান্ধীজীর কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য বিশেষ নমাজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বোরখা পরিহিতা মুসলিম মহিলারাও দলে দলে এই প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ সর্বত্রই সাধারণত শান্তিকামী ও সহিষ্ণু। কিন্তু এই মানুষকে নষ্ট করে আধুনিক শিক্ষা ও রাজনীতি। হিন্দু-মুসলমান শত শত বছর ধরে ভারতের অধিবাসীরূপে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। অবশ্য অশান্তি ও মারামারিও হয়েছে। কিন্তু সে তো ভাইয়ে ভাইয়েও বিরোধ ও মারামারি হয়। আমি নিজে একদা পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বংশানুক্রমিক বাসিন্দা ছিলুম। একেবারে জল জঙ্গল ও বিল প্রধান গ্রামের ছিলুম অধিবাসী। কিন্তু আমরা চতুর্দিকে যেন মুসলিম পরিবেষ্টিত ছিলুম। অর্থাৎ মুসলমানেরাই ছিলেন মেজরিটি। আমি নিজে প্রায় ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামেই ছিলুম। কিন্তু আমি কোন দিন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও দাঙ্গা ইত্যাদি দেখিনি। বরং দুধ, ডিম, শাক-সব্জি ইত্যাদি মুসলমান স্ত্রীলোকেরাই বিক্রি করতে হিন্দুদের বাড়িতে বাড়িতে আসতেন। তাঁদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ একেবারে নিকট আত্মীয় পরিজনের মত ছিল। আমার আজও মনে আছে একটি মুসলিম স্ত্রীলোক আমাদের গ্রামের বাড়িতে দুধ বিক্রি করতে আসতেন এবং আমার মাকে বিলক্ষণ জানতেন। আমাদের এক-চালা ঘরের (আমরা গরিব ছিলুম) বারান্দায় আমি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সেই স্ত্রীলোকটি আমার দিকে তাকিয়ে আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন—

'আপনার পোলা (অর্থাৎ পুত্র) বুঝি ?' মা সম্মতিসূচক মাথা নাড়লে সেই স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত দরদমিশ্রিত স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—

'আহা, বাইচ্যা থাকুক।'

বোধহয় ৭৪/৭৫ বছর আগেকার কথা। তবু সেই সরল গ্রাম্য মুসলিম স্ত্রীলোকটির কণ্ঠস্বর আজও ভুলিনি।

এমন অপূর্ব ছিল আমাদের হিন্দু-মুসলিম সাধারণ নরনারীর সম্পর্ক। কিন্তু সেই দেশে এলো পরাধীনতা, এলো ডিভাইড অ্যান্ড রুল্ এবং হলো দেশ পার্টিশান। আজও তার ফল ভোগ করছি।

মহাত্মা গান্ধী কূটনৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্রনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন নীতিপন্থী, আদর্শবাদী, ধর্মনিষ্ঠ মানুষ, যিনি দেশের স্বাধীনতার চেয়েও সত্য (Truth) ও অহিংসাকে বড় স্থান দিতেন। বোধহয় তিনি বুদ্ধ ও যীশুর মত গোটা মানবসমাজকে নিজের সাধনার দ্বারা পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি একান্তরূপেই ঈশ্বর-সমর্পিত পুরুষ ছিলেন। অবশ্য তিনি ইংল্যান্ডের রাস্কিন এবং রুশিয়ার টলস্টয়ের দ্বারা প্রথম জীবনে (দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময়) গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। টলস্টয় যেমন সোভিয়েত বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করেছিলেন, গান্ধীজীও তেমনি ভারতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত কার্যই নির্ভুল ছিল না। কারণ, তিনি কতকগুলি গুরুতর ইস্যু রাষ্ট্রনৈতিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি, করেছিলেন উদার মানবিক এবং নৈতিক আদর্শের দিক থেকে। সুতরাং শেষ পর্যায়ে দেখা যায় যে, তিনি জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার প্যাটেলের মত ভক্ত ও অনুরক্তদের কাছ থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

গান্ধীজী জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে উপবাসে মৃত্যুভয় দেখিয়ে ভারত সরকারকে ৫৫ কোটি টাকা দিতে বাধ্য করাবার ফলে দেশব্যাপী প্রচণ্ড অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। আরও স্মরণীয় যে, গান্ধীজীর এই অনশনের প্রতি পাকিস্তানের নরনারীর একটা বড় অংশ সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও মহম্মদ আলী জিন্নার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছিল কিনা, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অন্তত আমার চোখে পড়েনি। অন্যদিকে পাকিস্তানকে—যে পাকিস্তান ও জিন্না কাশ্মীর ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তখন ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালিয়েছিল, ভারতের কাছ থেকে পাওয়া টাকা দিয়ে শক্তিশালী করে দেওয়ার ফলে জনমত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। এমনকি, গান্ধীজী যখন অনশনরত ছিলেন, তখন এই প্রথম দিল্লির পথে পথে জনগণের কণ্ঠে গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রোষ প্রকাশ পেল এবং লোকে বলাবলি করতে লাগলো, 'বুড়োটা আর কতদিন আমাদের এভাবে জ্বালাবে ?'

এমনকি গোটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গান্ধীজীর দাবির ফলে যেন প্রচণ্ডভাবে আহত হলো—বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তাঁরা অনশনরত

গান্ধীর খাটিয়ার ধারে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের এক বিশেষ অধিবেশনের পর্যন্ত অনুষ্ঠান করলেন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁদের আপত্তি ও প্রতিবাদ নিয়ে আলোচনা করলেন। গান্ধীজী সেই মুমূর্ষু অবস্থায় প্যাটেলের আপত্তির কথা জেনে খুব নিম্ন আর মৃদু স্বরে মন্তব্য করলেন—'আমি যে সর্দারকে জানতাম, এই সেই সর্দার নয়।'

সেই সময় দিল্লির বিড়লা ভবনের পাশ দিয়ে পঞ্জাব থেকে পলায়িত একদল বাস্তুহারা শোভাযাত্রা সহকারে স্লোগান উচ্চারণ করে যাচ্ছিল। একটা গোলমালের শব্দ কানে আসাতে গান্ধীজী তাঁর পার্শ্বচরদের মধ্যে প্যারেলালকে (সেক্রেটারি) জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা কি বলতে বলতে যাচ্ছে ?

প্যারেলাল একটু ইতস্তত করে ঢোক গিলে জবাব দিলেন—ওরা বলছে—'Let Gandhi die ! গান্ধীকে মরতে দাও !'—ফ্রীডম্ অ্যাট্ মিডনাইট।

বোম্বাইয়ের উত্তর উপকণ্ঠে তখন বীর সাভারকারের 'সাভারকার সদনের' দোতলায় পুরানো গৃহে কয়েকজন আর এস এস বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ-এর যুবক একত্র হয়েছিলেন গান্ধী কর্তৃক পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা আদায় করে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে। বীর সাভারকার ভারতীয় বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম ছিলেন। যেমন ছিল তাঁর সাহস ও দুঃসাহসিক কার্যাবলী তেমনি ছিল বাগ্মীতার মোহিনী শক্তি। এমন কি নেহরুর চেয়েও তাঁর বক্তৃতার জোর অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন একান্তরূপেই হিন্দু সনাতন সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং মুসলমানদের বিরোধী। গান্ধীজীর কাণ্ড কারখানার উপর তাঁরা কড়া নজর রেখেছিলেন। পুনার এই বিখ্যাত বিপ্লবপন্থী যুবকদের কাছে ইতিহাসের আদর্শ পুরুষ ছিল শিবাজী। সাভারকারের নেতৃত্বে এই যুবকদের দল ক্ষেপে উঠলো। পুণা থেকে তাঁদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের একটি সাপ্তাহিক মুখপত্রও বেশ জাঁকালো ভাবে প্রকাশিত হতো এবং সেখানে বসেই হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শলাপরামর্শ করা হতো। সাভারকার নাকি এই সময় গান্ধী, নেহরু এবং সুরাবর্দীকে খতম করারও পরিকল্পনা করেছিলেন। কেবল ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে আদায় করে দেওয়ার জন্যই পুণার মারাঠী যুবকেরা ক্ষিপ্ত ছিলেন না। প্রকাশ যে, সেই সময় পঞ্জাব থেকে মুসলিম কর্তৃক ধর্ষিতা ও নির্যাতিতা নারীরা দিল্লিতে এসে আশ্রয় নেওয়ার পর গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এর প্রতিকার কি ? গান্ধীজী নাকি এই সমস্ত নারীকে অহিংস সত্যাগ্রহী আদর্শে আত্মরক্ষার পরামর্শই দিয়েছিলেন। সেটা কি রকম ?—জিজ্ঞাসা করা হলে গান্ধীজী নাকি জবাব দিয়েছিলেন—দাঁতে দাঁতে চেপে পড়ে থাকতে, তবু ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কোন সহিংস বল প্রয়োগ নয়।

এই ধরনের কথা পল্লবিত আকারে প্রচারিত হওয়ায় যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লো। পুণার ষড়যন্ত্রকারীরা অবিলম্বে গান্ধীকে সাবাড় করার জন্য কেবল প্রতিজ্ঞা করলো না, কার্যকরী পন্থা অবলম্বনেও অগ্রসর হলো। কারণ তাঁদের মতে মুসলমানেরা কেবল পাকিস্তান সৃষ্টি করে ভারত খণ্ডন করেনি, তারা পঞ্জাবের ও ভারতের হিন্দু নারীদের সতীত্ব নাশ করে এবং পুরুষদের হত্যা করে বীভৎসতার চূড়ান্ত করেছে। এক কথায় তারা ভারতকে খণ্ডন ও ধর্ষণ করেছে! সেই মুসলিমদের তোষণ করছে গান্ধী। সুতরাং গান্ধীর বেঁচে থাকার কোন রাইট বা অধিকার নেই।

এই সমস্ত কাজে কখনও টাকার অভাব ঘটে না, এদেরও ঘটলো না। এমনকি গোপনে বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা রিভলভারও সংগৃহীত হলো।

গান্ধীজীর আত্মবিসর্জনের পর গান্ধীজীর প্রতি ভক্তিমান অনেকে প্রচার করতে চেয়েছেন যে গান্ধীজী তাঁর আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে যেন দিব্য দৃষ্টি বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য তাঁরা তাঁর শেষ অনশনের সময় তাঁর জীবনান্ত সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে থাকেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস এই সমস্ত মন্তব্যের মধ্যে পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার যে অসম্ভব দাবি পূরণের জন্য তিনি অনশনে তনু ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন, সেটা কতটা সফল হবে, সে বিষয়ে তাঁর কিছুটা সংশয় ছিল। বিশেষত ৭৮ বছরের বার্ধক্যজীর্ণ দেহে অনির্দিষ্টকাল উপবাস করতে গেলে মৃত্যুর যে একান্ত সম্ভাবনা, সে বিষয়ে তিনি সম্যক সচেতন ছিলেন। সুতরাং ১৯৪৮ সালের ১২ জানুয়ারি শেষ উপবাসের সংকল্প ঘোষণার পর প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বললেন—"সকলের কাছে অমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, আপনারা শান্ত-সমাহিত চিত্তে এর (অনশনের) উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবেচনা করুন এবং আমাকে যদি মরতেই হয় তবে শান্তিতে মরতে দিন। ভারতবর্ষ, হিন্দুধর্ম, শিখধর্ম ও ইসলামের ধ্বংসের অসহায় দর্শক হবার পরিবর্তে আমার গৌরবজনক রক্ষাকর্তা হবে।"

অবশ্য একথা সত্য যে, আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুর কথাও তাঁর মনে এসেছিল এবং সেই সম্পর্কে তাঁর উক্তি নিঃসন্দেহে মহৎ এবং মানবজাতির পক্ষে শিক্ষণীয়।

২৮ জানুয়ারী বিড়লা ভবনে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় একটি বোমার বিস্ফোরণ হয়েছিল। অমৃত কাউর এ সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করলে ঐদিন সন্ধ্যায় গান্ধীজী তাঁকে বলেছিলেন: "এই প্রশ্নের অর্থ কি এই যে, তোমরা আমার জন্য উদ্বেগ বোধ করছ? আমাকে যদি কোন উন্মাদের বুলেটে মৃত্যুবরণ করতে হয়, আমি যেন তা হাসিমুখে করতে পারি। আমার ভিতর তখন যেন বিন্দুমাত্র ক্রোধের উদ্রেক না হয়। ঈশ্বরের নাম তখন যেন আমার হৃদয়ে এবং ওষ্ঠে থাকে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গান্ধীজী যেন শেষ পর্যন্ত 'দিব্যদৃষ্টি'র বলেই আততায়ীর গুলিতে মৃত্যুর সম্ভাবনাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। যাঁরা মানবজাতির শিক্ষক তাঁদের অনেকেরই মৃত্যু স্বাভাবিক হয়নি—হয়েছে অপমৃত্যু। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসেরও হ্যামলক বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

সেই ভয়ংকর দিনটির কথা আজও আমার মনে আছে। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি আমি বাগবাজার ষ্ট্রীটের যুগান্তর সম্পাদকীয় দপ্তরে আসীন। হঠাৎ যেন একটা গুঞ্জন কানে এলো গান্ধীজীর মৃত্যু সম্পর্কে। সহসা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই আশ্চর্য পুরুষ, যাঁর সত্য, অহিংসা ও মানবতাবোধ ছিল অতুলনীয়। তাঁর যে কোন হত্যাকারী থাকতে পারে একথা তখন আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। আর আমার বয়সও ছিল অল্প। কিন্তু সন্ধ্যার পর যুগান্তরের সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে আমি বেরিয়ে ক্রমশঃ শ্যামবাজারের সেই বিখ্যাত কোলাহলমুখরিত চৌরাস্তার মোড়ে এলাম। কিন্তু অবাক হলাম কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। সমগ্র এলাকা এবং শহর যেন গভীর নিস্তব্ধ—কেমন একটা ভয়ার্ত আবহাওয়া চারদিকে, আমার শরীর ও মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সেই সময় শুনতে পেলাম, নয়াদিল্লীতে সন্ধ্যাবেলা গান্ধীজীকে খুন করা হয়েছে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেই ভয়ংকর কাণ্ডের ঘটনা পরে শুনতে পেলাম। আমার কাছে কলিকাতা মহানগরী এবং সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিস্বাদ হয়ে গেল—মনে হলো আমি এক প্রেতপুরীর মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি—যেখানে মানুষ নেই, মানবতার কোন চিহ্ন নেই। কী এক সাংঘাতিক জগতের আমরা বাসিন্দা। ঘটনাটি এমনই সাংঘাতিক যে ১৯৪৮ সালের পর আজ আমি ১৯৯১ সালে পৌঁছেছি। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আত্মাহুতি দানের সেই ভয়ংকর ঘটনা আজও ভুলতে পারিনি। কেবল আমরা নই ভারতের বাইরে পশ্চিমের বহু চিন্তাশীল মানুষ ও লেখক গান্ধীজীর এই হত্যাকে যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয়বার ক্রুশে আত্মদান বলে লিখেছেন। এটা সত্যি সত্যিই যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে বিদ্ধ সেই মহান মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয়। সেই জন্যই এত বছর পরেও মানুষ সেই ঘটনাকে ভুলতে পারেনি।

কিন্তু এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিল কারা? এই বিষয়ে বহু তদন্ত হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওলটালে দেখা যায় মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত রক্ষণশীল গোঁড়া ও মুসলিম বিদ্বেষী পতিতবামন ব্রাহ্মণরাই ছিল এর উদ্যোক্তা। এই দলটির সবচেয়ে বড়ো পরিচয় যে এদের যিনি নেতা তিনি একজন ভারত বিখ্যাত পুনার স্বনামধন্য বিপ্লবী নেতা বীর সাভারকর। কিন্তু ভয়ানকরূপে হিন্দুর সাম্প্রদায়িক কৌলিন্যে বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন

ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান। এবং এখানে হিন্দুদেরই একাধিপত্য থাকা উচিত। এমন কি যারা মুসলমানদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আপস রক্ষার পক্ষপাতী সাভারকরের এই দল তাদেরও সাবাড় করতে প্রস্তুত ছিল। অনেক চক্রান্ত করে নাথুরাম গড্‌সে ও অন্যান্যরা দিল্লীতে এসে তাদের উপযুক্ত জায়গায় আড্ডা নিল। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি ৫-১৭ মিঃ সময় গান্ধীজীকে নাথুরাম গড্‌সে খুন করে। এজন্য তার বিবেকে বিন্দুমাত্র আটকায়নি। বরং ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলবার আগে সে ধীর স্থিরভাবে এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েছিল। এ থেকেই বোঝা যায় এরা কি ভয়ঙ্কর রকমের এরিরিষ্ট ছিল। নারায়ণ অ্যাপটে (বয়স ৩৪); বীর সাভারকার, নাথুরাম গড্‌সে (বয়স ৩৯), শঙ্কর কিমত্রে, গোপাল গডসে (বয়স ২৯), মদনলাল পাহে (বয়স ২০), দিগম্বর বাজাজ (বয়স ৩৭) এদের সকলকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্তু নাথুরাম গডসে ও কয়েকজনের ফাঁসী হয়। বাকী সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গান্ধীজী কিন্তু এতো ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং মানবপ্রেমী ছিলেন যে গুলি খেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তাঁর মুখ দিয়ে 'হে রাম' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল।

জওহরলাল নেহরুকে যেমন স্বাধীন ভারতের রূপকার বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তেমন ডাঃ বিধান রায়কে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু ইদানীং কালের বহু মানুষের ধারনা নেই যে তিনি কত বড়ো ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্ববান মানুষ সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে কেন সারা ভারতে আর কেউ ছিলেন না। অবশ্য তাঁর এই ব্যক্তিত্বের খ্যাতি বহুদূর প্রসারিত। এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে তুমি বলে সম্বোধন করতেন। এজন্য লোকে বিস্ময় বোধ করতো। আমি অতুল্য ঘোষ মহাশয়ের মুখে শুনেছি যে তিনি পায়েস খেতে খুব ভালবাসতেন। এবং জওহরলাল নেহরুকে তিনি পায়েস খাইয়েছিলেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িটি ছিল একটা তীর্থক্ষেত্রের মতো। নামী অনামী বহুপ্রকারের মানুষের ভীড় সেখানে হতো। কারণ বিধানচন্দ্র রায় শুধু মুখ্যমন্ত্রী রূপে খ্যাতিমান ছিলেন না, চিকিৎসক হিসাবেও তিনি ছিলেন ধন্বন্তরীর মতো। এরকম চিকিৎসক আমাদের দেশে আগে কোন দিন জন্মাননি। আমাদের দেশে একটা চলতি বিশ্বাস আছে যে জন্ম এবং মৃত্যু যাঁর একই দিনে তিনি একজন মহাপুরুষ। একথা বিধান রায়ের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য কেননা তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু একই দিনে ঘটেছিল। ১লা জুলাই তারিখে তিনি জন্মেছিলেন এবং ঐ তারিখেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল। একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেবো। ১৯৬১ সালে তিনি গিয়েছিলেন নানা কাজ

উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তখন মিঃ কেনেডি ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট। সেই সময় কেনেডির কি একটা অসুখ ছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম চিকিৎসক হিসাবে তাঁর কানেও পৌঁছেছিল। সেইজন্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে দেখবার জন্য ডাঃ রায়ের কাছে অনুরোধ এলো। তিনি হোয়াইট হাউসে গিয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে দেখলেন। এবং যে স্টেথিস্কোপটি দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করা হচ্ছিল ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সেটি হাতে নিয়েই বললেন, 'এটা তো ত্রুটিপূর্ণ'। শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এবং তক্ষুনি একটি নতুন স্টেথিস্কোপ তাঁকে এনে দেওয়া গেল। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ফলে ডাঃ রায়ের অসামান্য চিকিৎসক প্রতিভা আরও বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। ১৮৮২ সালের ১লা জুলাই পাটনার বাঁকিপুরে তিনি জন্মেছিলেন। আর তিনি ৮১ বছর বয়সে ১৯৬২ সালে ১লা জুলাই দেহ ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত তাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন। এই অসাধারণ পুরুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবং আমি প্রায়শই তাঁর সেই সুবিখ্যাত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাসভবনে যাতায়াত করতাম। তাঁকে ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান ভারতরত্ন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল।

এই সঙ্গেই আমার এই জীবনের পাণ্ডুলিপি শেষ হয়ে গেল। কেননা আমার বাকী জীবনে আর কি ঘটবে তাতো আমি জানিনা। জীবনের পাণ্ডুলিপি পাঠকের কাছ থেকে এখানেই বিদায় নিল।

আমার শ্রেষ্ঠ সম্পাদকীয়

৪ নভেম্বর, ১৯৪২ (যুগান্তর)

ঝড়ের বন্ধন মুক্তি !

এতদিন পর বাংলা সরকার মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার প্রলয়ঙ্কর ঝড়কে সরকারিভাবে স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা দীর্ঘ দুই সপ্তাহকাল ঝড়ের সংবাদ চাপিয়া রাখিয়া গত সোমবার রাতে কিছু বিবরণ ছাপিতে দিয়াছেন। সংবাদটি একটি বিজ্ঞপ্তির আকারে স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই ধরণের সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলিয়া আমরা জানি না। অগ্নিকাণ্ড, ঝড় বা ভূমিকম্পের সংবাদ আমরা 'রয়টারে'র কল্যাণে দূরবর্তী সমুদ্রপারের দেশগুলি হইতে পাই, সেই সমস্ত দেশ যুদ্ধরত হওয়া সত্ত্বেও মানুষের দুর্গতি ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কণ্ঠরোধ করেন না। কিন্তু এই দেশে সংবাদ ও সংবাদপত্রের উপর হিটলারী শাসন চলিতেছে। যুদ্ধ অনেক দেশেই হইতেছে এবং পরাজয় ও সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণও বহু স্থানে ঘটিতেছে। কিন্তু যেখানে হাজার হাজার মানুষ মারা গেল, দেশ বিধ্বস্ত হইল, সেখানে গভর্ণমেণ্ট নির্বিকার ঔদাসীন্যে সমস্ত সংবাদ গোপন করিয়া প্রজাপালনের গর্ব ও গৌরববোধ করেন, ইহা কেবল পরাধীন ভারতবর্ষে ও সেই ভারতবর্ষের হৃদয়হীন ও মস্তিষ্কহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন শাসকবর্গের পক্ষেই সম্ভব। গভর্ণমেণ্ট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাথমিক হিসাবে একমাত্র মেদিনীপুর জেলায় ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় ১ হাজার লোক মারা গিয়াছে। ঈশ্বর না করুন, আজ যদি ইংলণ্ডের কোন অংশে ১১ হাজার লোক এক রাত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে মারা যাইত, তবে পার্লামেণ্টে ও সংবাদপত্রে সেই ভয়াবহ সংবাদ কি ক্রমাগত ১৪/১৫ দিন চাপিয়া রাখা সম্ভব হইত ? কোন বীর সেনাপতি বা মন্ত্রীর পক্ষেই ইংলণ্ডে এমন 'অত্যাচার' করা সম্ভব হইত না ! ভারতবর্ষেই ইহা সম্ভব, কারণ এই দেশ শাসনের জন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহারা ইংরাজ, তাঁহারা সহরে নিরাপদে মোটা মাহিনায় মেদবহুল জীবনযাপন করেন। তাঁহাদের সঙ্গে বাঙ্গলার নরনারীর, বাঙ্গলার পুত্রকন্যার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। সুতরাং হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার এই নির্লজ্জ অভিব্যক্তিতে ইউরোপীয় সভ্যতার বাহকগণ এতটুকু কুণ্ঠা ও সংকোচ বোধ করেন না। গত ১লা কার্তিক এবং ১১ই কার্তিকের 'যুগান্তরে' এই ঝড়ের ইঙ্গিত আমরা দিয়েছিলাম এবং গভর্ণমেণ্টকে আমরা বার বার অনুরোধ করিয়াছিলাম দেশ-

বাসীকে তথ্য সরবাহের জন্য। এই দুর্বিপাক সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে কিছু অভিজ্ঞতাও আমাদের ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতার কথা চুলায় যাউক—প্রতিদিন রাশি রাশি চিঠি, মর্মস্পর্শী বিবরণ আমাদের দপ্তরে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সরকারি দপ্তরের বন্ধন দশা ডিঙ্গাইয়া ঝড় ছাপার হরফে আত্মপ্রকাশ করতে পারিল না। সেন্সরের দাপটে ঝড়ের আর্তনাদ সেক্রেটারিয়েট ভবনের প্রাচীর গাত্রে ব্যাহত হইল।

আজ সেই ঝড়ের বন্ধন মুক্তি ঘটিয়াছে। বড় কর্তাদিগকে ধন্যবাদ যে, গত সপ্তমী পূজার ঝড় আগামী বৎসরের পূজার আগেই তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারি উদারতা ও বিধিব্যবস্থার যে তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা পড়িয়া করুণা ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের বক্ষ বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিতেছে। "ক্ষতির সংবাদ গভর্ণমেণ্টের নিকট পেঁছামাত্র কলিকাতা হইতে লঞ্চ ও বজরায় করিয়া কাঁথি ও তমলুক মহকুমাস্থ উপকূলবর্তী এলাকায় জল, খাদ্য, ঔষধপত্র, কলেরা প্রতিষেধক টীকা, ডাক্তার ও সাহায্যকারী দল পাঠান হয়। এই সমস্ত এলাকায় এই পর্যন্ত এইরূপ চারটি সাহায্যকারী দল পাঠান হইয়াছে। ২৪-পরগণা জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কালেক্টারে অবিলম্বে এইরূপ সাহায্যকারী দল পাঠান।" পাঠকগণ যেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ রাখেন যে, যেখানে ১১ হাজার লোক সরকারি হিসাবেই মারা গিয়াছে সেখানে ৫টি সাহায্যকারী দল পাঠানো হইয়াছে! সোজা কথা নয়, পুরো এক গণ্ডা সাহায্যকারী দল! ঔষধপত্র, খাদ্য, জল, প্রতিষেধক টীকা ইত্যাদি সবই পাঠানো হইয়াছে, কিন্তু পরিমাণ ও সংখ্যা কি? যে সমস্ত সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস জনসাধারণের সর্বনাশের মাত্রা সরকারি বিবৃতির চেয়ে আরও অনেক বেশি হইয়াছে এবং প্রাণহানি ১০ হাজারের চেয়েও অনেক বেশি। দেশের জন্য লাঞ্ছনা বরণে এবং স্বদেশ সেবায় মেদিনীপুর জেলা ইতিপূর্বে সরকারের নিকট বহু নিগ্রহ পাইয়াছে, এখানে প্রকৃতিদেবীর হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়া বাকি পুরস্কারটুকু পুরাপুরি তাঁহারা পাইলেন। সরকারি ইস্তাহারে অগণিত মানুষের ব্যাপক সর্বনাশের জন্য এতটুকু সমবেদনার বাণী বর্ষিত হয় নাই, মনে হয় একটি হৃদয়হীন যন্ত্রের মধ্য দিয়া একটি শুষ্ক বিবৃতি বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডে কোন সামান্য দুর্ঘটনা হইলে রাজা ও প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ দুর্গতদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, এমন কি কোন অভিনেত্রী মারা গেলে (এলেনটেরীর মৃত্যু স্মরণীয়) পর্যন্ত শোক প্রকাশ করা হয়। ইহা ভদ্র নীতি এবং সভ্য মানুষের নীতি। কিন্তু বাঙ্গলার লাট ও ভারতবর্ষের বড় লাটের দিকে চাহিয়া দেখ ১১ হাজার লোকের প্রাণহানির সংবাদের তাঁহারা একটি মৌখিক সহানুভূতির বার্তা পর্যন্ত এই দেশবাসীকে জানান নাই। বিলাতী কুকুরের বিয়োগ বেদনায় বিলাতী পুরুষের হৃদয় ব্যথিত হয়, কিন্তু হাজার

হাজার মানুষের জীবন ও সময় তুচ্ছ মনে হয়। আমরা সভ্য রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত, সন্দেহ নাই।

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় যাহা ঘটিয়াছে তাহাকে সোজা বাঙ্গলায় প্রলয়কাণ্ড বলা যাইতে পারে। ভয়াবহ ঝটিকা ও সেই সঙ্গে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস সমস্ত কিছু ভাসাইয়া চুরমার করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের দুর্বিপাকের ইতিহাসে ইহা অভূতপূর্ব, বোধহয় বিহারের ভূমিকম্পেও এত লোক মারা যায় নাই। যে দুর্বিপাক ভূমিকম্পকেও ছাড়াইয়া যায় তাহার সর্বনাশা মূর্তি কল্পনা করাও শক্ত, তথাপি সেই কল্পনাতীত ব্যাপার ঘটিয়াছে। এই প্রকার দুর্বিপাকে কংগ্রেস চিরদিন দুর্গতদের সেবায় অগ্রসর হইয়াছে, হাজার হাজার মহাপ্রাণ যুবক প্রাণ দিয়া ক্লিষ্ট নরনারীর সেবা করিয়াছে। কিন্তু সেই কংগ্রেস আজ বে-আইনী, কর্মীদল কারান্তরালে অন্তর্হিত। দুর্গতদের সেবা আজ কে লইবে? অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, আশ্রয়শূন্য এবং পানীয় জল শূন্য হাজার হাজার অর্ধমৃত আর্ত নরনারীকে আজ কে ভরসা দিবে, আশ্রয় দিবে, অন্ন দিবে, জল দিবে? কংগ্রেস যে মহৎ ব্রত পালন করিত, সেই ব্রত পালনের জন্য আমরা বাঙ্গলার মনুষ্যত্বের নিকট, দয়াবান, হৃদয়বান ও কর্তব্যপরায়ণ দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছি—তাঁহারা অগ্রসর হউন আর্তের সেবায়, বিপন্নের উদ্ধারে এবং অন্নহীন ও বস্ত্রহীন জীবন-রক্ষায়। গভর্ণমেণ্টের নিকট খুব বেশী প্রত্যাশার আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, কারণ যে দেশে ১১ হাজার লোকের প্রাণহানির সংবাদ ১৪ দিন ধরিয়া স্বেচ্ছায় গোপন করিয়া রাখা হয়, সেই সমস্ত মনুষ্যত্ববিমুখ কর্মচারীর নিকট আর্তসেবার আবেদন নিষ্ফল। ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের ধ্বংসপ্রাপ্ত শ্মশান পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা অতিরিক্ত ভাতা ও বেতন পাইলেই তাঁহাদের চাকুরেজীবন সার্থক হইবে! হয়তো তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুষ্টমতি মেদিনীপুর হইতে কিভাবে লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করা যায়, তেমন একটা স্কীম রচনা করিয়া বিভাগীয় কমিশনার কিম্বা চীফ সেক্রেটারীর পদে 'প্রমোশন' পাইবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব লইয়া আমরা আদৌ চিন্তিত নহি। আমরা সেই বাঙ্গলা দেশের নিকট আবেদন করিতেছি যে বাঙ্গলাদেশ ঝড়ে ভূমিকম্পে প্লাবনে ও দুর্ভিক্ষে দুর্গতদের সেবায় উদার হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন।